৭

রাজনৈতিক সংগঠন
Political Organization

নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। সাধারণভাবে যে সকল সমাজে রাষ্ট্র নেই সে সকল সমাজ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আগ্রহ দেখাননি। সেই সব সমাজ নিয়ে বরং নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ছিল। নৃবিজ্ঞানের এই শাখার নাম কেউ কেউ রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলে থাকেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝতে গিয়ে রাষ্ট্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে: রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে এমন সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই এমন সমাজ (রাষ্ট্রবিহীন সমাজ) এই দুই ভাগে সমস্ত সমাজকে আলাদা করে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আজকাল অনেক নৃবিজ্ঞানীই এরকম ভাগ করাতে আপত্তি তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে ক্ষমতাকে বুঝবার জন্য, বিশ্লেষণ করবার জন্য নৃবিজ্ঞান কাজ করতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্র নেই এমন সমাজের অস্তিত্ব এখন পাওয়া যায় না। কারণ কোন না কোন রাষ্ট্র সকল সমাজকেই গ্রাস করেছে। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান এই শাখার ব্যাপারেও কোন কোন নৃবিজ্ঞানী সমালোচনা করছেন। নৃবিজ্ঞানের সকল শাখার পাঠেই ক্ষমতার ব্যাপারে উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন বলে তাঁদের অভিমত। এই সকল প্রসঙ্গ নিয়ে এই ইউনিট গঠিত। এতে ৪টি পাঠ আছে যাতে আপনারা উপরে আলোচিত বিষয়গুলো পরিচিত হবেন। এ ছাড়াও এই ইউনিটে একটি পাঠ আছে যাতে বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই অঞ্চলে এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। এই অঞ্চলের কৃষকেরা সেই সময়কাল থেকেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানান প্রতিরোধ করে আসছেন। নৃবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব ব্যাপক।

- ◆ পাঠ - ১ : রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
- ◆ পাঠ - ২ : রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থা
- ◆ পাঠ - ৩ : রাষ্ট্রব্যবস্থা
- ◆ পাঠ - ৪ : বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন

পাঠ - ১

রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
The Subject matter of Political Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চিরকালীন কোন ব্যবস্থা নয়
- নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি নিয়ে চলমান বিতর্ক
- রাষ্ট্রব্যবস্থার আগে এবং বর্তমান সমাজের নানান পরিসরে ক্ষমতা সম্পর্ক

আপনারা আগেই জেনেছেন যে নৃবিজ্ঞানীরা ইউরোপের বাইরে গিয়ে নানান সমাজ দেখতে পান যেসব সমাজে ইউরোপের থেকে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য সেখানকার ব্যবস্থা একেবারেই ভিন্ন। নিজ সমাজের বাইরে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার আলাদা স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও সেসব সমাজে আছে।

আমরা যখনই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলি আমাদের মাথায় ভেসে আসে সংসদ, নির্বাচন, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল – এমনি আরো অনেক কিছু। এর কারণ হ'ল আমরা ছোটবেলা থেকে এগুলোকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে জেনে এসেছি। আপনারা আগেই জেনেছেন যে নৃবিজ্ঞানীরা ইউরোপের বাইরে গিয়ে নানান সমাজ দেখতে পান যেসব সমাজে ইউরোপের থেকে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য সেখানকার ব্যবস্থা একেবারেই ভিন্ন। নিজ সমাজের বাইরে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার আলাদা স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও সেসব সমাজে আছে। সেইসব সমাজের অনেকগুলিই তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন নয়। স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সে সব সমাজ। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে এসব সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। কারণ প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানে রাজনীতি বলতে কেবল রাষ্ট্র সংক্রান্ত কর্মকান্ড বোঝানো হয়ে থাকে। প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই জ্ঞান এতটাই শক্তিশালী যে বর্তমান কালের একজন সাধারণ মানুষ, যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েননি, তিনিও এইভাবে চিন্তা করে থাকেন। নৃবিজ্ঞানীরা প্রথম ভাবতে চেষ্টা করলেন যে এ সকল সমাজেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। এই ভাবনা-চিন্তা করবার জন্য তাঁদের প্রথমেই রাজনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞা বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিল। তাহলে গোড়াতেই প্রশ্ন চলে আসে কি বৈশিষ্ট্যকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা হবে।

নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রের উপাদানগুলি। যেমন: সরকার – এর দায়িত্ব ও গঠন, সংসদ, নির্বাচন, রাষ্ট্রের উদ্ভব, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, লোক প্রশাসন, আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের ভূমিকা ইত্যাদি। এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখাপড়া অনেক প্রাচীন। ফলে সেই শাস্ত্রের ধারণা, সংজ্ঞা ও পদ্ধতি সব কিছুই যথেষ্ট পরিচিত। প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই সীমাতে অনেক সমাজের পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে নৃবিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বুঝিয়েছেন। কোন একটা সমাজ তাদের সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য এবং অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যে কর্মকান্ড এবং নীতিমালা থাকে তাকে সংক্ষেপে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এই চিন্তাধারা থেকে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের চর্চা শুরু করেন। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি তাঁদের এই চর্চা খুব বড় মাপের সমালোচনার মধ্যে পড়ে যায়। এই সমালোচনার মূল জায়গাটা হ'ল: কোন বিশেষ একটা শাখা হিসেবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে দেখা সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি। বরং রাজনীতিকে সর্বব্যাপী বিষয় হিসেবে দেখা দরকার। নিচে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চাইতে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে নতুন এবং ক্ষণস্থায়ী। নতুন এই কারণে যে, নৃবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবার বেশ পরে এই শাখার নাম শোনা গেছে। নির্দিষ্টভাবে বললে '৪০-এর দশকে। আর ক্ষণস্থায়ী এই কারণে যে, সমালোচনার পর রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান ঠিক আর একটা উপশাখা হিসেবে কাজ করছে না। বরং আরও ব্যাপক পরিসরে রাজনীতিকে বোঝার তাগিদ তৈরি হয়েছে পরবর্তীকালে। সেই তাগিদ থেকে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানকে একভাবে ভেঙ্গে নতুন ভাবে গড়ে

রাজনীতি কি সেটা বোঝার জন্য '৬০-এর দশকের পরে দুনিয়া জুড়ে নতুন তর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষভাবে নৃবিজ্ঞান সেই তর্কে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

তোলা হয়েছে। কারণ রাজনীতি কি সেটা বোঝার জন্য '৬০-এর দশকের পরে দুনিয়া জুড়ে নতুন তর্ক তৈরি হয়েছে। তবে এই সময়কালে ('৬০-এর দশকের পরবর্তী কালে) নৃবিজ্ঞানের পাশাপাশি অন্যান্য শাস্ত্রও নৃবিজ্ঞানের উপলব্ধি নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সেটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষভাবে রাজনীতি নিয়ে নৃবিজ্ঞানের ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব বোঝার জন্য এই বিষয়টা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে: ভূগোল, সামাজিক ইতিহাস, সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা, শিল্পকলা ও এর ইতিহাস, পুরাশাস্ত্র, দর্শন, এবং অবশ্যই নারীবাদ। তাহলে বলা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বদল ঘটেছে। সেই বদলকে লক্ষ্য করলেই মোটামুটি রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং এর মধ্যকার বিতর্ককে চেনা যাবে। এখানে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের নতুন কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগেই প্রথম যুগের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথম কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান

আগের আলোচনা থেকেই আপনারা দুটো স্পষ্ট ব্যাপার জানেন। তা হ'ল: এক, প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা থেকে ভিন্ন ভাবে নৃবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন; দুই, '৪০ –'৬০ এর দশকে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের মূল সময়কাল ছিল। কিন্তু পুরো বিষয়টা এত সহজ নয়। নৃবিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে সেই শুরুর কাল থেকেই। সেই হিসেবে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পর্বকালকে তিন ভাগে ভাগ করা সুবিধাজনক। প্রথম কালে লুইস হেনরি মর্গান, হেনরি মেইন, এমনকি হার্বার্ট স্পেন্সার-এর নাম চলে আসে। প্রথম কালের চর্চাকে অনেকেই রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান না বলে 'রাজনীতির নৃবিজ্ঞান' বলতে চেয়েছেন। এর একটা কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে এইসব নৃবিজ্ঞানীদের অনেককেই একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেটা হ'ল: আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা রেড ইন্ডিয়ান সমাজের উপর গবেষণা। এটা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটা বিরাট মাথাব্যথা ছিল। কারণ এই সব আদিবাসীদের জমি দখল করবার পর এবং তাঁদেরকে আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রের সাহায্যে বাগে আনার পর মার্কিন সরকার তখন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েছে। এই ব্যবস্থার মানে হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এবং সরকারী পরিকল্পনার অধীনেই কেবল এই আদিবাসীদের জীবন যাপন করতে হবে। এরকম পরিকল্পনা নেবার কারণে সরকারের জন্য খুব জরুরী হয়ে দেখা দিল শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন এবং আদিবাসীদের 'উন্নয়নের'র প্রশ্ন। ফলে মূলত আইন বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেয়া হ'ল যাতে তাঁরা আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব সংগঠন ও আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করেন এবং সরকারের সাথে আদিবাসীদের বিভিন্ন 'চুক্তি' খতিয়ে দেখেন। এভাবে প্রথম পর্যায়ে যে সকল কাজ পাওয়া যায় তার সবগুলিই আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের উপর করা গবেষণা কাজ। এখানে আলাদা করে উলে- খ করা দরকার মেইন-এর 'এনশিয়েন্ট ল' এবং মর্গান-এর 'এনশিয়েন্ট সোসাইটি' গ্রন্থের নাম। বিশেষভাবে মর্গানের নাম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই গবেষণা কাজ থেকে পরবর্তীতে নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী চিন্তার ভিত্তি তৈরি হয়। মর্গান দেখেছেন কিভাবে গোত্র সংগঠন থেকে ধীরে ধীরে সমাজে আধুনিক সরকারের কাঠামো তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ মর্গানের যুক্তি ছিল প্রথমে গোত্র সংগঠনই ছিল সরকারের আদিরূপ। হেনরি মেইনের কাজ অবশ্য আইনের বিবর্তন নিয়ে ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ... সরকারের জন্য খুব জরুরী হয়ে দেখা দিল শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন এবং আদিবাসীদের 'উন্নয়নের'র প্রশ্ন। ফলে মূলত আইন বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেয়া হ'ল যাতে তাঁরা আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব সংগঠন ও আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করেন এবং সরকারের সাথে আদিবাসীদের বিভিন্ন 'চুক্তি' খতিয়ে দেখেন। এভাবে প্রথম পর্যায়ে যে সকল কাজ পাওয়া যায় তার সবগুলিই আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের উপর করা গবেষণা কাজ।

পরবর্তী সময়কালে রেড ইন্ডিয়ানদের বাইরে বেশ কিছু গবেষণা চলতে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ইউরোপের তখন প্রায় সারা দুনিয়া ব্যাপী উপনিবেশ ছিল। তারা তখন আফ্রিকার প্রায় সকল অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য এবং ওশেনিয়াতে গবেষণা চালিয়েছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গবেষণা চলেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে, হাওয়াই এলাকায় কিংবা ফিলিপাইনে। এই সব গবেষণাতে কখনোই কিন্তু এই বিষয়টা গুরুতরভাবে আসেনি যে ইউরোপের এবং মার্কিনের রাজনৈতিক শক্তি কিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উপর চেপে বসে আছে। এ ধরনের সমালোচনা এসেছে আরো পরে। সত্যিকার অর্থে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নানান দেশ ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি পেয়েছে, এবং আরো পরে যখন

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হারলো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সারা পৃথিবী ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ প্রতিরোধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার সঙ্গেও এটার নিবিড় সম্পর্ক আছে। যাই হোক, যে সময়ের কথা হচ্ছে সেই সময়ে ফ্রাঞ্জ বোয়াস এবং ব্রনিস্‌ল ম্যালিনোস্কি-এর শিক্ষার্থীদের নাম চলে আসবে। কারণ তাঁরা তখন এই সব ফরমায়েশী গবেষণার কাজ করছেন। এই সকল গবেষণা হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকদের এবং বাণিজ্য করতে চাওয়া বড় বড় মার্কিন-ইউরোপীয় কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের দেয়া অর্থে। সেটা হ'ল ২০ ও ৩০-এর দশকের কথা। বোয়াসের শিক্ষার্থীরা মূলত আমেরিকান আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের অথবা ইউরোপের অধিকৃত কোন ভূখন্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের ওপর কাজ করেছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই গবেষণা কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল: **এগুলো আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কোনভাবেই সেগুলো রাজনৈতিক সম্পর্ক ও পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠেনি।** এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রে সংস্কৃতির ধারণাই কাজ করেছে, ক্ষমতার ধারণা নয়। দু' একটা গবেষণা আগ্রহী ছিল ইন্ডিয়ানদের সাথে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের সংঘর্ষ বা শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণকে চিহ্নিত করতে। সেই কাজগুলো কোনভাবেই সম্মুখভাগে আসতে পারেনি। এমন একজন গবেষক ছিলেন উইলিয়াম ক্রিস্টি ম্যাকলিওডএবং আরেকজন হচ্ছেন মনিকা হান্টার। বরং দেখা গেছে রবার্ট রেডফিল্ডের মত গবেষকগণ মেক্সিকোতে যখন রাজপথে বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তখন স্থান-কালহীন 'লোক'সমাজের গল্প নিয়ে এসেছেন। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, 'নেটিভ' মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন এবং পর্যুদস্ত করবার বাস্তব সমস্যা থেকে এবং তাদের মধ্যকার ইতিহাসের যে ভিন্নতা তার আগ্রহ থেকে ঔপনিবেশিক সময়কালে নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি বিষয়ক কিছু গবেষণা কাজ দানা বেঁধেছিল।

'নেটিভ' মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন এবং পর্যুদস্ত করবার বাস্তব সমস্যা থেকে এবং তাদের মধ্যকার ইতিহাসের যে ভিন্নতা তার আগ্রহ থেকে ঔপনিবেশিক সময়কালে নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি বিষয়ক কিছু গবেষণা কাজ দানা বেঁধেছিল।

'৪০ – '৬০ দশকের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় অনেক কিছু বদলে গেছে। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানও তখন বদলেছে। সত্যিকার অর্থে একটা উপশাখা হিসেবে এই নামটা – 'রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান' – পাওয়া গেল তখনই। কিন্তু বিস্ময়কর হ'ল তাতে আরো কট্টর ধরনের একটা শাস্ত্র দেখা দিল। আগে তবু দু' একটা নমুনা ছিল যাতে কিছু সমালোচনা পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক শাসনের। পরবর্তী কালে সেটাও আর তেমন দেখা দিল না। বরং এই সময়কার কাজে মূলত ক্রিয়াবাদী ধারাতে সমাজ-সংস্কৃতির প্রথাগত ধারণা ঘুরপাক খেয়েছে। এই সময়কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানেও ক্ষমতা সম্পর্ক কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের আলোচনা অনুপস্থিত। এখানে মুখ্যত বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এসেছে। বিভিন্ন সমাজ কথাটাকে এখানে একটু খতিয়ে দেখার দরকার আছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই একটা পদ (term) ব্যবহার করতে থাকেন। তা হ'ল - সরল সমাজ। যে সকল সমাজ আগে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন হয়েছে তাদের সকলকে 'সরল সমাজ' বলা হয়েছে। এই শব্দটি পূর্বতন 'আদিম সমাজ'-এর বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। কিন্তু আধুনিক সমাজ হচ্ছে অগ্রসর এবং সরল সমাজ হচ্ছে পশ্চাৎপদ – এই ধারণাটি তখনও কাজ করছে। সেই সরল সমাজগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা আলোচ্য কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিল। আগেই বলেছি যে এই সমাজগুলোর রাজনৈতিক বদল নিয়ে ভাবা হয়নি। বদল নিয়ে ভাবলে দেখা সম্ভব হ'ত কিভাবে ইউরোপীয় শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বলপূর্বক বদল ঘটিয়েছে। সেই আলোচনায় পরে আসবো। এটা জেনে রাখা দরকার এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলতে মূলত এই সময়কালের ('৪০ – '৬০ দশক) গবেষণা কাজ এবং ভাবনা-চিন্তাকেই দেখা হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও সাধারণভাবে এই সময়কালে গড়ে ওঠা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করা হয়ে থাকে।

কয়েকজন নৃবিজ্ঞানীর নাম আলাদা করে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার। যেমন: ই. আর. লীচ, মেয়ার ফোর্টস, ই. ই. ইভান্স প্রিচার্ড প্রমুখ। একটু পরের সময়ে ভিক্টর টার্নার, ম্যাক্স গ- াকম্যান কিংবা এফ. বেইলি'র নাম ও এই কাতারে চলে আসতে পারে। এই সময়ের কাজে মুখ্য তিনটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমটি আপনারা এর মধ্যেই জানেন। যদিও তাঁরা যে সমস্ত সমাজে গবেষণা করেছেন তার

নৃবিজ্ঞনীরা যে সমস্ত সমাজে গবেষণা করেছেন তার সবগুলোই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাধীন, তবু তাঁদের কাজে সেই ঔপনিবেশিক রাজনীতি আলোচিত হয়নি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে: তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন।

সবগুলোই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাধীন, তবু তাঁদের কাজে সেই ঔপনিবেশিক রাজনীতি আলোচিত হয়নি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে: তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ, সেই সকল সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে জ্ঞাতিসম্পর্ক খুব গুরুত্ব বহন করে – সেটাই ছিল তাঁদের যুক্তি। তৃতীয় বিষয়টা এটার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতি হিসেবেই দেখেছেন। এটা করতে গিয়ে তাঁরা 'রাষ্ট্র সমাজ বনাম রাষ্ট্রবিহীন সমাজ' – এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিহীন সমাজে কিভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করা হয়, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং অন্যান্য সমাজের সঙ্গে কিভাবে তারা সম্পর্ক রক্ষা করে – এই ব্যাপারে বর্ণনা করাই নৃবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ছিল। আগেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণেই বহু সংখ্যক মার্কিন এবং ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এই ধারার রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আবার এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ধারার রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান সমালোচিত হয়েছে। যে সকল নৃবিজ্ঞানী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা করেছেন তাদেঁর তত্ত্বকে ব্যবস্থা তত্ত্ব (system theory) বলা হয়ে থাকে। এর একটা সমালোচনা তো পরবর্তী কালে হয়েছে, ঐ সময়েই সক্রিয় তত্ত্ব (action theory) বলে একটা আর একটা ধারা জন্মলাভ করে। সেই ধারার নৃবিজ্ঞানীরাও তথাকথিত সরল সমাজেই গবেষণা করেছেন। তবে তাঁরা একটা ধারণা তাঁদের গবেষণাতে এনেছিলেন। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্য। টার্নার, গ- াকম্যান এই ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা রাজনীতি বলতে দেখিয়েছেন মানুষজনের রাজনৈতিক লক্ষ্য চিহ্নিত করা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে ক্ষমতা ব্যবহার করা। অর্থাৎ তাঁরা দেখেছেন কিভাবে বিভিন্ন সমাজের মানুষজন তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন।

সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান এবং ক্ষমতার ধারণা

'৬০-এর দশকের মাঝখান থেকে, বিশেষভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং পশ্চিমা দেশের স্টুডেন্টস মুভমেন্ট পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডে নানা রকম বদল ঘটে। এই বদলের মধ্যে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা। লেখাপড়ার জগতে তখন আলোচনা হতে থাকে ক্ষমতা প্রশ্নটিকে নিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের নতুন ধরন ইত্যাদি তখন আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। একই সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যকার সীমারেখাও তখন অনেক শিথিল হয়ে যায়। এই নতুন সময়ে নৃবিজ্ঞানীদের দিক থেকে একাধিক জোরদার পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন: ক্যাথলিন গফ ডাক দেন যাতে নৃবিজ্ঞান গবেষণা করতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে, বিপ্লব এবং প্রতি-বিপ্লব নিয়ে; তালাল আসাদের সম্পাদিত যুগান্তকারী গ্রন্থ *'এ্যান্থ্রোপলজি এন্ড দ্য কলোনিয়াল এন্‌কাউন্টার'* প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই সকল আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর একেবারে নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। নৃবিজ্ঞানীদের একটা বড় অবদান তখন দেখা যায় রাজনীতির সংজ্ঞা ও ধারণা নির্মাণে। সত্যিকার অর্থে এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানের একটা বড় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞান যা ভাবে – তাকে। নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতিকে এমনভাবে চিন্তা করা হ'ল যে প্রায় সকল স্থানে রাজনীতি থাকা সম্ভব। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বাইরের নৃবিজ্ঞানীরা অনেক বেশি তৎপর ভূমিকা রেখেছেন। একই সাথে ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে দেখা দিল। সেটা আগেই আপনাদের বলা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি বিষয়ক নতুন ভাবনার কয়েকটা তাগিদ নিয়ে সহজে আলোচনা করা যেতে পারে। সেই তাগিদ দিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞানের রাজনীতি ভাবনার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। তা হ'ল:

প্রথমত, রাজনীতি নিয়ে নৃবিজ্ঞানের কাজ করতে চাইলে প্রথমেই ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসকরা অধীনস্ত মানুষজনের জীবনকে বদলে দিয়েছে, দুমড়ে মুচ্‌রে দিয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপের এবং মার্কিনের নৃবিজ্ঞানীদের কাজের পরিবেশ নিয়ে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ প্রথম জমানায় তাঁরা সকলেই কাজ করেছেন ঔপনিবেশিক পরিবেশে এবং ঔপনিবেশিক সুবিধা নিয়ে।

ক্ষমতাকে সকল সম্পর্কের মধ্যে দেখতে হবে। কারণ সকল সম্পর্কের মধ্যেই ক্ষমতার প্রবাহ আছে। এর মানে হ'ল: রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা আর ক্ষমতাহীনতার সম্পর্ক দেখা। ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের সম্পর্ক দেখা। তাদের সম্পর্কই রাজনীতি।

তৃতীয়ত, ক্ষমতাকে সকল সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দেখতে হবে। কারণ সকল সম্পর্কের মধ্যেই ক্ষমতার প্রবাহ আছে। এর মানে হ'ল: রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা আর ক্ষমতাহীনতার সম্পর্ক দেখা। ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের সম্পর্ক দেখা। তাদের সম্পর্কই রাজনীতি।

চতুর্থত, প্রথম পর্যায়ের সকল পাঠ্যবই, গবেষণাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ লেখার মধ্য দিয়েও ক্ষমতা সংগঠিত হয়। যেমন, এথনোগ্রাফির লেখকরা এথনোগ্রাফির মাধ্যমেই কোন একটা জনগোষ্ঠীকে পাঠক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এখানে জ্ঞান বানাবার মধ্য দিয়ে ঐ জনগোষ্ঠীর চেহারা বানানো হচ্ছে। সেই চেহারা বানাবার কারিগর হিসেবে তিনি (এথনোগ্রাফি লেখক) এবং শাস্ত্র (নৃবিজ্ঞান) ক্ষমতাবান। এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে কিছু তাত্ত্বিক কাজ করেছেন যাঁরা নৃবিজ্ঞানের বাইরের। যেমন, মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাঈদ প্রমুখ।

পঞ্চমত, আপাত চোখে পড়ে না – এমন সব সম্পর্কের বেলায়ও রাজনীতিকে চিনতে হবে। যেমন ধরা যাক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক। নারী-পুরুষের সম্পর্কও যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সেই উপলব্ধি নৃবিজ্ঞানে নতুন। যেহেতু নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। বৈষম্য বা অসমতাকে রাজনৈতিক হিসেবে চিনতে হবে। ক্ষমতার এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞান কাজ করছে – সেটা যেমন সত্যি, আবার এই উপলব্ধিটা এখন আর নিছক একটা কোন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে আটকে নেই।

ষষ্ঠত, আধুনিক রাষ্ট্র ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

সারাংশ

প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিহীন সমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলতে সেটাই বোঝা হ'ত। তাঁদের মুখ্য যুক্তি ছিল সকল সমাজেই রাজনীতির প্রসঙ্গ জড়িত। কিভাবে কোনও বিশেষ একটি সমাজে নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা দেখভাল করা হচ্ছে সেটাই রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছিল। ইদানিং কালের নৃবিজ্ঞানীরা রাজনীতি বলতে ক্ষমতা প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে রাষ্ট্র থাকা না থাকা আর মুখ্য ব্যাপার নয়। ক্ষমতা প্রসঙ্গকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে ভাববার ফলে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিধি এখন অনেক প্রশস্ত। তবে অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান নামে একটি শাখা থাকার বিপক্ষে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। যে সকল নৃবিজ্ঞানী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন তাঁদের তত্ত্বকে ---------- বলা হয়ে থাকে।

ক. সক্রিয় তত্ত্ব　　খ. ব্যবস্থা তত্ত্ব
গ. বিবর্তনবাদী তত্ত্ব　　ঘ. ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

২। নিচের কোন বইটি নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ কর্তৃক সম্পাদিত?

ক. এ্যান্থ্রোপলজি এন্ড দ্য কলোনিয়াল এন্‌কাউন্টার
খ. হিস্ট্রি এ্যান্ড এথনলজি
গ. দ্য সোশ্যাল সিস্টেম
ঘ. স্টাডিজ ইন এনশিয়েন্ট হিস্টরি

৩। নিচের কোন দশককে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের মূল সময়কাল ধরা হয়?

ক. ৩০ - ৫০　　খ. ৪০ - ৬০
গ. ৬০ - ৮০　　ঘ. ৫০ - ৭০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলতে আপনি কী বোঝেন?
২। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্যগুলির থেকে শ্রেয়তর বলা কী সম্ভব?
২। কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক দিক হ'ল সবল কর্তৃক দুর্বলকে নিয়ন্ত্রণ আপনার কি মনে হয় যুক্তি সহকারে লিখুন।

রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থা
Stateless Systems

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ইউরোপের দিগ্বিজয়ের আগে লক্ষ লক্ষ সার্বভৌম রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল
- রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থায় সামরিক শক্তি অর্জনের বদলে সামাজিক কর্মকান্ড বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল
- রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থায় সম্পদকেন্দ্রিক সংঘর্ষ কম ছিল

রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার নমুনা নৃবিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন ইউরোপের বাইরে। আগের পাঠ থেকে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন উপনিবেশে নৃবিজ্ঞানীগণ গবেষণা করেছেন গত শতকের শেষভাগ থেকে। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা হয় এই শতকের মাঝামাঝি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বিভিন্ন দেশে ইউরোপের মত রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটছে তখনও নানান অঞ্চলে অন্যান্য ধরনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও প্রক্রিয়া চালু ছিল। ফলে নৃবিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও মাঠ গবেষণায় সেইসব নমুনা দেখতে পেয়েছেন। সেই সব রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনাই রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছিল – তা আপনারা এর মধ্যেই জানেন। এখানে দুটো ব্যাপার লক্ষ্য রাখলে আমাদের পক্ষে বিষয়টাকে বোঝা সহজ হবে। প্রথমত, নৃবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে আধুনিক কালের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ছিল। দ্বিতীয়ত, যে সমাজই হোক না কেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেখানে স্থির কিছু নয়। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপে যে কোন অঞ্চলে এবং যে কোন জাতিতে নিজস্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বদল ঘটছিল। সুতরাং নৃবিজ্ঞানীরা একটা বদলমান পরিস্থিতির স্বাক্ষী ছিলেন তাঁদের গবেষণার সময়ে। এটা আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীদের কাজেই এই পরিস্থিতি নিয়ে কোন ব্যাখ্যা নেই। আগেই বলেছি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কিছু নৃবিজ্ঞানী বুঝিয়েছেন কোন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজের সদস্যদের দ্বারা সামাজিক নিয়ম পালন করানো, এবং কারো কারো ব্যাখ্যায় সম্পদের বণ্টন প্রক্রিয়া তদারকি করার একটা ব্যবস্থা। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চার সংগঠনে ভাগ করেছেন। ব্যান্ড রাজনৈতিক সংগঠন, "ট্রাইব" বা "উপজাতীয়" রাজনৈতিক সংগঠন, চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র এবং রাষ্ট্র।

ব্যান্ড সমাজ

ব্যান্ড হচ্ছে কিছু মানুষের একটা দল যাঁরা সম্পর্কে পরস্পর খুবই কাছাকাছি, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করেন এবং রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম।

নৃবিজ্ঞানী যাঁরা তথাকথিত 'সরল সমাজে'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের অনেকের মতেই ব্যান্ড সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে সরল ধরনের। ধারণা করা হয়ে থাকে যে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজেই এই ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকে। আর তাদের প্রধান আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক লেনদেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির ধারণা কিংবা চর্চা এসব সমাজে নৃবিজ্ঞানীরা দেখতে পাননি। বিশেষ করে পানি, জমি এই ধরনের সম্পদের বেলায় শরীকী ব্যবহারের প্রচলন থাকে। সম্পদ, সম্মান-আত্তি এবং ক্ষমতার ভেদাভেদে সমাজের মানুষজনের মধ্যে তেমন ফারাক নেই। এই আলোচনার শুরুতেই ব্যান্ড বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে তা বলা যায়। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, **ব্যান্ড হচ্ছে কিছু মানুষের একটা দল যাঁরা সম্পর্কে পরস্পর খুবই কাছাকাছি, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করেন এবং রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম।**

ব্যান্ড সমাজে সাধারণ মানুষজন কিংবা সম্প্রদায় একটা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে থাকেন। এর মানে হ'ল এই ধরনের সমাজে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক একক। এর

বাইরে বৃহত্তর অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নৃবিজ্ঞানীদের বড় একটা অংশই মনে করেন যে খাদ্য সংগ্রহকারী প্রত্যেক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কৃষি আবিষ্কৃত হবার আগে, অর্থাৎ ১০,০০০ বছর আগে প্রায় সকল সমাজেরই এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বলে তাঁদের অভিমত। এই দলগুলো খুব বেশি বড় মাপের নয় আর জনসংখ্যার ঘনত্ব তেমন নয়। এক একটা ব্যান্ড দলে ২০ থেকে ৫০ জনের মত সদস্যের কথা উলে- খ পাওয়া যায়। আর এক একটা অঞ্চলে ৫ থেকে ৫০ বর্গ মাইল এলাকায় একজনের বাস। তবে যে সময়ে নৃবিজ্ঞানীরা এই সব সমাজ নিয়ে গবেষণা করছেন সেই সময়ে এইসব সমাজের মানুষজনের অনেকেই ইউরোপ থেকে বয়ে আনা রোগের শিকার হয়ে মারা পড়েছেন। ফলে এদের জনসংখ্যার হিসাব একটা গোলমেলে ব্যাপার।

আধুনিক সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে ব্যান্ড সমাজের নেতৃত্বকে বোঝা যাবে না। কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব এই ধরনের ব্যবস্থায় নেই। নেতা বলতে যাঁরা শিকারে দক্ষ, বিচক্ষণ এবং বয়সে বড় তাঁরাই। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন বয়স একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ-ইউরোপীয় সমাজে। বিচক্ষণতা, দক্ষতা এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে জ্ঞান থাকার মধ্য দিয়ে একজন প্রবীণ অন্যদের সম্মান অর্জন করে থাকেন। এভাবে নির্বাচিত নেতা বা প্রধান কোনমতেই কারো উপর তাঁর মতামত এবং ভাবনা-চিন্তা চাপাতে পারেন না। সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়া হ'ল: ব্যান্ডের সকল প্রবীণ মানুষজন একত্রে আলাপ-আলোচনা করেন। নেতা বড়জোর তা পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা দেখান। অনেক সমাজেই নিজস্ব ভাষায় এই রকম নেতাকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে 'মুরুব্বী' বা 'জ্ঞানী' বলে। সমাজে যাঁরা অন্য কোন উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করে সেগুলো অন্যদের মাঝে বিলি বণ্টন করেননি, তাঁদেরকে ঠিক 'ধনী' বলা হয় না। আর তা বলা হলেও তার সাথে নেতার বিরাট পার্থক্য আছে। নেতৃত্বকে ঠিক ক্ষমতার আধার হিসেবে বলা যায় না। বরং নেতার কাজ হচ্ছে প্রভাবিত করা।

এস্কিমোদের প্রত্যেক দলের মধ্যে এরকম প্রধান ছিলেন। সেই সব প্রধানকে অন্যরা মানতেন তাঁর দক্ষতা এবং সুবিচার করার মন মানসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে।

এস্কিমোদের প্রত্যেক দলের মধ্যে এরকম প্রধান ছিলেন। সেই সব প্রধানকে অন্যরা মানতেন তাঁর দক্ষতা এবং সুবিচার করার মন মানসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে। প্রধানের নানাবিধ পরামর্শ দলের সদস্যরা মেনে চলতেন। এর মানে এই নয় যে তাঁর কোন স্থায়ী ক্ষমতা ছিল কিংবা চাইলেই তিনি কারো ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারতেন। এস্কিমোদের মধ্যে এই নেতা বা প্রধানেরা সকলে পুরুষই ছিলেন। তবে তাঁরা নারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন বিভিন্ন বিষয়ে (জিন এল ব্রিগ্স ১৯৭৪)। যে কোনভাবেই চিন্তা করি না কেন, নেতৃত্বের অর্থের একটা সীমারেখা ছিল।

*ব্যান্ড সমাজের মানুষের মধ্যে কাউকে ঠকানোর কোন প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারেননি নৃবিজ্ঞানীরা। ... আফ্রিকার **কুং!** -দের মধ্যে মাংশ ভাগ না করে খাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। নৃবিজ্ঞানী মার্শাল যখন **কুং!** দের মধ্যে কাজ করছিলেন, তিনি কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ... পরিবারের জন্য মাংস সরিয়ে রাখতে ... শুনে তারা খুবই হেসেছিল। **কুং!** দের কাছে এটা খুবই খারাপ একটা ব্যাপার। তাহলে তো মানুষ সিংহের মতো হিংস্র হয়ে গেল। সমাজের অন্যরাও তখন তাকে শিংহের মতো সমাজ থেকে দূরে তাড়িয়ে দিবে।*

ব্যান্ড সমাজের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, কাউকে শাস্তি দেবার জন্য শিথিল কতগুলো নীতিমালা থাকে। যেমন একত্রে নিন্দা করা, তিরস্কার করা কিংবা এড়িয়ে চলা। খুব বড় কোন ক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা বা সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া ঘটতে পারে। সমাজের মানুষের মধ্যে কাউকে ঠকানোর কোন প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারেননি নৃবিজ্ঞানীরা। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আফ্রিকার কালাহারি এলাকার **কুং!**-দের মধ্যে মাংস ভাগ না করে খাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। নৃবিজ্ঞানী মার্শাল যখন কুং!-দের মধ্যে কাজ করছিলেন, তিনি কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যদি কেউ কাউকে না জানিয়ে পরিবারের জন্য মাংস সরিয়ে রাখতে পারেন তাহলে তো আর অন্যকে ভাগ দিতে হয় না। শুনে তাঁরা খুবই হেসেছেন। কুং!-দের কাছে এটা খুবই খারাপ একটা ব্যাপার। তাহলে তো মানুষ সিংহের মত হিংস্র হয়ে গেল। সমাজের অন্যরাও তখন তাকে সিংহের মত সমাজ থেকে দূরে তাড়িয়ে দেবে। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য এক টুকরো মাংসও খেতে দেয়া হবে না। চুরি করাও কুং!-দের মধ্যে জঘন্য ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। খুব কমই এসব ঘটে। তবু কেউ চুরির মত কোন অপরাধ করলে তার মুখের উপর কারো পায়ের ছাপ এঁকে দেয়া হয়, যাতে সকলেই চিনে যেতে পারে। চুরি কিংবা খাদ্য ভাগ করার অপরাধকে সব ব্যান্ড সমাজেই বিরাট করে দেখা হয়ে থাকে। তবে কুং! জাতি এই সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ

হিসেবে স্বীকৃত। কোন কোন ব্যান্ড সমাজের মধ্যে চুরির কিংবা ভাগ না দেবার প্রবণতা নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। যেমন: বলিভিয়ার আমাজন বেসিনের **সিরিওনো** জাতি। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে খাদ্যের সংকট এবং দুর্ভিক্ষ একটা প্রধান কারণ বলে ধরে নেয়া হয়। **ইনুইত**-দের কেউ সামাজিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কোন ওঝা তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বলে, কিংবা অপরাধ আরো গুরুতর বলে বিবেচিত হলে তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতে পারে।

ব্যান্ড সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘর্ষ চালাবার জন্য কোন সামরিক বাহিনী নেই। এমনকি দল বেঁধে তেমন বড় মাপের কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতও ঘটে থাকে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো সাথে কারো লড়াই ঝগড়া হতে পারে। কিংবা পারিবারিকভাবে দীর্ঘকাল ফ্যাসাদ লেগে থাকতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে খুন জখমের মত ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। তবে সমাজের মধ্যেই সেগুলো নিষ্পত্তি ঘটিয়ে ফেলতে সক্ষম তারা। সাধারণত নেতা বা প্রধানরা একত্রে নিয়ে বসেন উভয় পক্ষকে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মুষ্টিযুদ্ধ বা গানের লড়াইয়ের মাধ্যমে ঝগড়া মেটানোর ঘটনা দেখেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। তা হচ্ছে: যখন কোন লোকের সঙ্গে কারো ঝগড়া বেধেছে এবং প্রতিহিংসা কাজ করছে, তখন উভয়কে সম্মত করানো হয় যাতে তারা একত্রে গানের লড়াইয়ে বা মুষ্টিযুদ্ধে সামিল হয়। গানের ক্ষেত্রে নিজস্ব সুরের সাথে তীক্ষ্ণ কথা জুড়ে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে তর্ক বাধায়। যার দিকে তালি বেশি পড়ে সেই জয়ী – এই পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হয়। এতে করে ঝগড়ার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় এবং শত্রুতা কমে। এরকম নজির পাওয়া গেছে **ইনুইত**-দের মাঝে।

"ট্রাইব" বা "উপজাতীয়" সমাজ

ব্যান্ড সমাজের সঙ্গে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজের পার্থক্যের মূল জায়গা হ'ল: এখানে সমাজের মধ্যে কতগুলো সংঘ কাজ করে। অর্থাৎ, ব্যান্ড সমাজে যেমন ব্যান্ডই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একক, এখানে সদস্যদের নানাবিধ সার্বভৌম সংঘ থাকে আর সেই সংঘগুলোর নানাবিধ রাজনৈতিক দায়িত্ব বা ভূমিকা থাকে। "উপজাতীয়" রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেই সংঘগুলো রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে। আবার সেই সংঘগুলোর সমন্বয়ে খোদ ট্রাইবটির রাজনৈতিক কার্যাবলী চলে। সেই হিসেবে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুস্থানীয় রাজনৈতিক সংহতি বলা যেতে পারে। তবে সেই সংহতিকে স্থায়ী বলা যায় না। বরং কোন সমস্যা বা বহিঃ আক্রমণের কালে এই সংহতি কাজ করে। এই সংঘগুলোর মধ্যে যোগাযোগ থাকে সমস্যাটা যতদিন আছে ততদিনই। তারপর নিজ সার্বভৌম এলাকায় সংঘগুলো আবার ফিরে যায়।

"উপজাতীয়" রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতকগুলো সংঘ রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে। আবার সেই সংঘগুলোর সমন্বয়ে খোদ "উপজাতী" টির রাজনৈতিক কার্যাবলী চলে। সেই হিসেবে "উপজাতী" রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুস্থানীয় রাজনৈতিক সংহতি বলা যেতে পারে।

নৃবিজ্ঞানীরা **ট্রাইব বলতে বুঝিয়েছেন কতকগুলি ব্যান্ডের সমন্বয় যেখানকার সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতি তাদের এবং একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে।** বাংলাদেশে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী ট্রাইবের পরিভাষা হিসেবে 'উপজাতি' বলে থাকেন। এটা সরকারেরও ভাষ্য। ইংরেজি 'ট্রাইব' কিংবা বাংলা 'উপজাতি' – দুই শব্দেরই রাজনৈতিক সমালোচনা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত উপজাতি নিয়ে রাষ্ট্রের ব্যাখ্য এবং আচরণ এই সমালোচনার কারণ। তাছাড়া নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই রাষ্ট্রের এবং শক্তিশালী জাতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন বলে সেটাও সমালোচনার কারণ হয়েছে। ট্রাইবের সদস্য সংখ্যা ব্যান্ড-এর তুলনায় অনেক বেশি। কতকগুলির আকার বেশ বড়। আফ্রিকার **টিভ**দের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। আবার **নুয়ের**দের সংখ্যা ইভান্স প্রিচার্ডের গবেষণার সময়কালে প্রায় ২ লক্ষাধিক ছিল। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী মনে করেন ক্ষুদ্র-জাতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজ মূলত পশুপালন এবং চাষবাষ কেন্দ্রিক। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্বও ব্যান্ড-এর তুলনায় বেশি।

ব্যান্ড সমাজের মত এখানেও জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা খুবই ব্যাপক। নৃবিজ্ঞানীরা ট্রাইব সমাজের রাজনৈতিক চালিকা শক্তির মূল কেন্দ্র মনে করেছেন জ্ঞাতিসম্পর্ককে। আগেই উলে- খ করা হয়েছে যে, এর সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এখানে নানাবিধ সংঘ রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে।

ট্রাইব বা "উপজাতি" মধ্যকার এইসব সংঘের মূল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক। **গোত্র** (ক্লান) হচ্ছে এ ধরনের সংঘের একটা ধরন। আরেকটি ধরন হচ্ছে **খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন** (সেগমেন্টারি লিনিয়েজ সিস্টেম)। রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবার ক্ষেত্রে এই দুই সংঘের ব্যাপক গুরুত্ব। এ ছাড়াও **সমবয়সীদের দল** (এজ সেট) খুবই তৎপর বলে মনে করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। বিশেষভাবে পূর্ব ইউরোপের "উপজাতি" সমূহের (ট্রাইব) মধ্যে এর কাজ আলাদা করে ধরা পড়ে। সমবয়সী-দলের কাজ হচ্ছে জাতির বিভিন্ন স্থানীয় অংশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা, সমন্বয় করা। বিশেষ করে কোন বহিঃজাতির আক্রমণের সময়ে। তবে নৃবিজ্ঞানীরা এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন বিভাজিত গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে। নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহলিন্স (১৯৬১) এবং তারও আগে ইভান্স প্রিচার্ড (১৯৪০) আফ্রিকার টিভ এবং নুয়ের সমাজের উপর এ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন।

খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন হচ্ছে গোত্রের মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর বিভাজন

খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন হচ্ছে গোত্রের মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর বিভাজন। যেমন: **নুয়ের**দের মধ্যে মোটামুটি ২০ টির মত গোত্র খুঁজে পাওয়া গেছিল। প্রত্যেকটি গোত্র একাধিক গোষ্ঠী বা লিনিয়েজ-এ বিভাজিত। গোত্রের প্রথম ভাগকে নৃবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ম্যাক্সিমাল গোষ্ঠী। এরপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলে পাওয়া যায় মেজর গোষ্ঠী, মাইনর গোষ্ঠী এবং মিনিমাল গোষ্ঠী। এক একটা মাইনর লিনিয়েজ ৩ থেকে ৫টা প্রজন্মের মানুষজনকে ধারণ করে থাকে। সংহতির ব্যাপারটা হচ্ছে: যদি দুইটা মিনিমাল লিনিয়েজ পরস্পরের সাথে গোলমাল করে তাহলে অন্য মিনিমাল গোষ্ঠী নাক গলাবে না। কিন্তু গোলমালটা যদি হয় এমন কোন দলের সাথে যাদের সাথে আরো পুরোনো প্রজন্মের সম্পর্ক তাহলে গোটা মাইনর গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে যেতে পারে। এভাবে পুরো প্রক্রিয়াটা চলে। পরিশেষে সমস্ত ক্ষুদ্র-জাতি বা ট্রাইব একত্রিত হয়ে যেতে পারে যদি আক্রমণ আসে অন্য কোন জাতি হতে। এরকম ধ্রুপদী একটা উদাহরণ হচ্ছে **নুয়ের** এবং **ডিংকা**দের মধ্যকার দীর্ঘকাল ব্যাপী লড়াই। সংঘর্ষ এবং লড়াইয়ের এই প্রসঙ্গ থেকে সহজেই বোঝা যায় ব্যান্ড সমাজের চেয়ে এই ধরনের সমাজে সামরিক চর্চা জোরদার ছিল। মার্শাল সাহলিন্স মনে করেছেন যে খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন শক্তিশালী ট্রাইবকে নিজেদের এলাকা বাড়াতেও সাহায্য করেছে। কোন একটা শক্তিশালী "উপজাতি" তুলনামূলকভাবে দুর্বল জাতির বসবাস এলাকাকে পছন্দ করলে সেটা দখল করবার চেষ্টা করতে পারত এই বৃহৎ গোষ্ঠীর আত্মীয় সম্পর্কের কারণে। এ ছাড়াও বহু জাতির মধ্যে বছরে কোন সময়ে একত্রে কোন উৎসবে যোগ দিয়ে সংহতি প্রকাশ করা এবং আনন্দ করবার চল ছিল। বিশেষত ইউরোপ এই সব অঞ্চল দখল করবার আগে।

বহু জাতির মধ্যে বছরে কোন সময়ে একত্রে কোন উৎসবে যোগ দিয়ে সংহতি প্রকাশ করা এবং আনন্দ করবার চল ছিল। বিশেষত ইউরোপ এই সব অঞ্চল দখল করবার আগে।

ব্যান্ড সমাজের মত এখানেও নেতৃত্ব কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। ক্ষমতার তুলনায় এখানেও প্রভাবই মূল চালিকাশক্তি। সাধারণত দক্ষতা, বিচক্ষণতার মাপকাঠিতেই নেতা বা প্রধান থাকতেন কেউ। নুয়েরদের মধ্যে গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশে বংশের কেউ একজন নেতা থাকতেন যিনি তাঁর স্থানীয় বংশ সদস্যদের কোন রকম শাসন করতে পারতেন, কিংবা দলের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপের কারণে কাউকে একঘরে করবার উদ্যোগ নিতে পারতেন। আমেরিকার আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকম নেতা রাখবার রেওয়াজ ছিল। যেমন **শেয়েনে** জাতির মধ্যে যুদ্ধের প্রধান এবং শান্তির প্রধান ছিল। কানাডার **ওজিবোয়া**দের মধ্যে যুদ্ধের নেতা, শিকারের নেতা, উৎসবের নেতা এবং গোত্র নেতা ইত্যাদি বিভাজন ছিল। কিছু ক্ষেত্রে নেতার পদ ছিল আরও ক্ষমতাধর এবং আরও বেশি সদস্যদের উপর চর্চা করবার মত। যেমন, দক্ষিণ ইরানের **বাসেরি** যাদেরকে পশুপালক যাযাবর বলা হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য অনাড়ম্বর ব্যবস্থা ছিল এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতা করে এগুলো হ'ত। সংঘাত যদি "ট্রাইবে"র ভেতরকার সদস্যদের মধ্যেই ঘটে থাকে, তাহলে নেতাগণ বিবাদকারী পক্ষকে আলোচনা করিয়ে নিষ্পত্তি করে দেন। যদি খুন বা এরকম বড় কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে গবাদি পশু ছিল মাধ্যম, যেহেতু মূলত পশুপালন সমাজ এগুলো। আর যদি কোন সদস্য এমন কিছু করে থাকে যাতে খোদ জাতিটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তার ব্যবস্থা হয় ভিন্ন। এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। **শেয়েনে** জাতি যখন মহিষ

শিকারে বের হয় তখন যাতে কেউই মহিষদের আগে ভাগে সতর্ক করে না দেয় বা ভাগিয়ে না দেয় তার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা আছে। তাঁদের কাজ কাউকে শাস্তি দেয়া নয়। তাঁরা কেবল নজরদারি করেন। এরপরও এই ধরনের অপরাধী কেউ থাকলে প্রহরী বাহিনীর কাজ হচ্ছে সেই লোক যাতে নিজ সমাজের নিয়ম মানে তার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে চাবুক মারার শাস্তি হতে পারে, কিংবা ঘোড়ার কান কেটে নেয়া যেটা খুবই লজ্জাকর হিসেবে বিবেচিত।

রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন: ক) দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের প্রক্রিয়ার উপর; খ) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার পদ্ধতির উপর; গ) সমাজের সামরিক প্রস্তুতির উপর।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা জরুরী। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন: ক) দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের প্রক্রিয়ার উপর; খ) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার পদ্ধতির উপর; গ) সমাজের সামরিক প্রস্তুতির উপর। এতে করে মনে হতে পারে অ-ইউরোপীয় সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরবর্তী কালের অনেক নৃবিজ্ঞানীই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই সব গবেষণায় গবেষক আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন 'সরল সমাজের' মানুষেরা যথেষ্ট শৃঙ্খলাপরায়ন নন। তাঁদের যুক্তিতে এই সব সমাজের "উপজাতি"সমূহের মধ্যকার অধিকাংশ দাঙ্গাই ইউরোপীয় হস্তক্ষেপে তৈরি হয়েছে। কারণ সমাজে সম্পদের উপর তখন টান পড়েছে। উপরন্তু এসব সমাজে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ সামাল দেবার জন্য তাদের যথেষ্ট কায়দা কানুন জানা ছিল। তাঁরা এই যুক্তিও দেখিয়েছেন যে ইউরোপের সামরিক প্রস্তুতির সামনে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার এই সব জাতি এতটাই অসহায় ছিল যে তাদের মধ্যকার সামরিক প্রস্তুতি আর হাঙ্গামা না দেখে ইউরোপের ভূমিকা দেখাই নৃবিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারত। যেহেতু রাজনীতির অর্থ, তাঁদের মতে ক্ষমতার পার্থক্য এবং ক্ষমতার সম্পর্ক।

চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র

এখানে অতি সংক্ষেপে চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেই খানিকটা পরিষ্কার হবে ইউরোপের ভূমিকা এবং প্রথম যুগের অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকা। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রকে দেখতে চেয়েছেন ব্যান্ড বা ট্রাইবাল সমাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং গোছালো রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে। এখানে আবার স্মরণে আনা দরকার যে রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থার থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উন্নত এবং উৎকৃষ্ট হিসেবে দেখা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থার মধ্যে ব্যান্ড সমাজের থেকে ট্রাইব বা ক্ষুদ্র-জাতি সমাজকে উন্নত ভেবেছেন এবং চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রকে ভেবেছেন এর থেকে উন্নত। বিবর্তনবাদী চিন্তার প্রভাবে এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। এর মানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে ক্রমশ নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর দেখা হয় এভাবে:

ব্যান্ড সমাজ–-> ট্রাইব বা লোক- "উপজাতি" –-> চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র –-> রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ব্যান্ড সমাজে এবং ক্ষুদ্র-জাতিগত সমাজে সামাজিক নিয়ম কানুন রক্ষা করা এবং শাস্তি বিধানের জন্য যেখানে শিথিল এবং অনাড়ম্বর পদ্ধতি ছিল, মুখিয়াতন্ত্রে এই পদ্ধতিগুলো কঠোর এবং আড়ম্বর হিসেবে দেখা দিল। অনেক নিয়ম-কানুন পাকা পোক্ত ভাবে তৈরি হ'ল। আগে যেখানে সমাজের মুরুব্বীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নানা ধরনের ফয়সালা করা সম্ভব হ'ত সেখানে চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেয়া আছে। কিন্তু চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রের মূল পরিচয় এখানেই সীমিত নয়। পূর্বেকার ব্যান্ড সমাজে কিংবা ট্রাইব সমাজে মানুষের মধ্যে মর্যাদার ভেদে কিংবা সম্পদের ভিত্তিতে অবস্থানের কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মুখিয়াতন্ত্রে মর্যাদা ভেদে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। সমাজের সকল মানুষের মর্যাদা সেখানে নির্দিষ্ট। তাহলে **চীফডম বলতে বোঝানো হয়ে থাকে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা নির্দিষ্ট থাকে, মর্যাদা এবং সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে এবং সমগ্র গোষ্ঠীর একজন আনুষ্ঠানিক প্রধান থাকেন যাঁর শাস্তি দেবার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে**। সত্যিকার অর্থে সমগ্র গোষ্ঠীর একজন

আনুষ্ঠানিক এবং ক্ষমতাবান নেতা থাকার কারণে এই ব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্র বিহীন ব্যবস্থার চেয়ে একেবারে ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানের সাথে যাঁর আত্মীয়তা যত নিকট তাঁর সামাজিক মর্যাদাও তত বেশি। এর মানে প্রধানের মর্যাদার সাথে অন্যদের মর্যাদা সম্পর্কিত। প্রধানের ধন-সম্পদ বেশি থাকার নজির পাওয়া গেছে সর্বত্র। চীফ বা প্রধানের একটা দপ্তর থাকে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। সেখান থেকেই তিনি শাসন কার্যের বড় সিদ্ধান্তগুলো নেন।

পলিনেশিয়া এবং আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের জাতিসমূহের মধ্যে দেখা গেছে প্রধানের সাথে যাঁর আত্মীয়তা যত নিকট তাঁর সামাজিক মর্যাদাও তত বেশি। এর মানে প্রধানের মর্যাদার সাথে অন্যদের মর্যাদা সম্পর্কিত। প্রধানের ধন-সম্পদ বেশি থাকার নজির পাওয়া গেছে সর্বত্র। চীফ বা প্রধানের একটা দপ্তর থাকে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। সেখান থেকেই তিনি শাসন কার্যের বড় সিদ্ধান্তগুলো নেন। অনেক চীফডমে একাধিক পরগণা বা এলাকা ভাগ করা থাকতে পারে, সবগুলোতেই আলাদা প্রধান থাকবেন। চীফডমের প্রধানের অধীনস্ত তাঁরা। কাউকে শাস্তি প্রদানের পরিষ্কার ক্ষমতা ছিল তাঁর। খাদ্য এবং শ্রম বণ্টন করবার সামর্থ্যও তাঁর স্বীকৃত। যেমন **ফিজিয়ান** চীফডমে চীফের দায়িত্ব ছিল খাদ্য পুনর্বণ্টন এবং শ্রমশক্তি নিয়োগ করার তদারকি করা। একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুখিয়াতন্ত্রে সামরিক প্রস্তুতি আগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনেক জোরদার ছিল। সাধারণভাবে পশুপালক সমাজে এবং সাধারণ কৃষিভিত্তিক সমাজে চীফডমের অস্তিত্ব পেয়েছেন নৃবিজ্ঞানীরা।

এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার। ইউরোপীয় শাসকরা যখন বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে তখন চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। দুই একটা অঞ্চলে যে ধরনের চীফডম ছিল সেখানে চীফের ক্ষমতা কিংবা নিয়ন্ত্রণ কোনটাই তেমন তীব্র ছিল না। আজকের নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই ব্যাখ্যা করছেন যে ইউরোপের শাসকরা এই ধরনের চীফডম তৈরি করেছে। আর নৃবিজ্ঞানীরা সেটাই পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে অনেক চীফডমের চীফদের ক্ষমতা কাগজে কলমে সংরক্ষিত ছিল। তার মানে হ'ল আধুনিক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা চীফের ক্ষমতা স্বীকৃত। সহজেই বোঝা যায় এই স্বীকৃতি কারা দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় ঔপনিবেশিক শাসন কাজ চালাবার সুবিধায় এবং মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করবার কাজটা সহজ করবার জন্য ইউরোপের শাসকরা এই পদটা দাঁড় করিয়েছে। সেটা বোঝার জন্য আমরা কাস্টমারি ল' বা প্রথাগত আইনের কথা বলতে পারি। আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার সমাজে ঔপনিবেশিক আমলে কাস্টমারি ল' লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার মানে ইউরোপের শাসনের আগে ঐ আইনগুলো একই রকম ছিল না এবং তার তীব্রতাও ছিল না। যেহেতু লেখ্য আইনের শাসন শক্তি বেশি। চীফডম আসলে আধুনিক পদ্ধতিতে মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল।

সারাংশ

রাষ্ট্রবিহীন সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। নৃবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণায় সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছেঃ ব্যান্ড সমাজ, ট্রাইবাল বা "উপজাতি" সমাজ, চীফডম বা মুখিয়া তন্ত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ব্যবস্থার উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে নৃবিজ্ঞানীদের দেখা এই সকল সমাজ তখন বহির্শক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বিশেষভাবে চীফডমের কথা এখানে বলা হয়। ইউরোপের শক্তি বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেবার পর রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। বলিভিয়ার আমাজান বেসিনের 'সিরিওনো' জাতির মধ্যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত?

ক. ব্যান্ড সমাজ | খ. ট্রাইব
গ. চীফডম | ঘ. রাষ্ট্র

২। নৃবিজ্ঞানীরা ট্রাইব সমাজের রাজনৈতিক চালিকা শক্তির মূল কেন্দ্র মনে করেছেন --- ---------- ---।

ক. অর্থনৈতিক সম্পর্ককে | খ.জ্ঞাতি সম্পর্ককে
গ. সামাজিক সম্পর্ককে | ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩। বিবর্তনবাদী চিন্তায় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্রমশ নীচু স্তর থেকে উচু স্তর দেখা হয় কিভাবে?

ক. ব্যান্ড → ট্রাইব বা লোক - 'উপজাতী'→ চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র → রাষ্ট্রব্যবস্থা
খ. ট্রাইব বা লোক - 'উপজাতী' → ব্যান্ড → চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র → রাষ্ট্রব্যবস্থা
গ. ব্যান্ড → চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র → ট্রাইব বা লোক - 'উপজাতী' → রাষ্ট্রব্যবস্থা
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানীরা ব্যান্ড সমাজের কী বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন?
২। মুখিয়াতন্ত্র বা চীফডম বলতে নৃবিজ্ঞানীরা কী বুঝিয়েছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ট্রাইবাল বা "উপজাতীয়" রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সংঘভিত্তিক ব্যবস্থা – ব্যাখ্যা করুন।
২। প্রাক্-রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলুপ্ত হবার কারণ ও প্রেক্ষাপটকে আপনি কীভাবে দেখেন?

পাঠ - ৩

রাষ্ট্রব্যবস্থা
State System

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সামরিক শক্তি
- রাষ্ট্রব্যবস্থার চাপে রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে
- রাষ্ট্রব্যবস্থাতে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়ে থাকে

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা। অর্থাৎ প র্বতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে নানা প্রকার শিথিলতা ছিল, এবং ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জড়ো ছিল না, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা জড়ো হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে।

আমরা যে সময়কালে জন্মেছি সেই সময়কালে রাষ্ট্রের অর্থ দুনিয়া ব্যাপী বিস্তার হয়েছে। রাষ্ট্র ছাড়া কোন সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব এখন। কেবল তাই নয়, সকল সমাজে রাষ্ট্রের চেহারা একই রকম দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যখন দুনিয়া জুড়ে বাণিজ্য করতে বের হয়েছে। এর মানে এই নয় যে বাইরের শক্তি আসবার আগে পৃথিবীর সকল স্থানে একই রকম অবস্থা ছিল। বরং, তখন এক এক অঞ্চলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সেটা ভাল না মন্দ তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বোঝার বিষয় হ'ল: আধুনিক কালে সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা কাঠামোর দিক থেকেও, আবার সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনার দিক থেকেও। আর এটা ঘটেছে ইউরোপীয় শক্তির বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের চারটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

ক) **রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা।** অর্থাৎ পূর্বতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে নানা প্রকার শিথিলতা ছিল, এবং ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জড়ো ছিল না, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা জড়ো হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চীফডমও বটে। তবে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত উদাহরণ। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানাবিধভাবে ক্ষমতার নানা স্তর থাকে। কখনো সেটা সরাসরি নানান দপ্তরের মাধ্যমে, কখনো অনানুষ্ঠানিকভাবে। আর সম্পদের ভিত্তিতে ক্ষমতা এখানে নিশ্চিত হয়েছে। যাবতীয় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম। কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র – যেমন: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান কিউবা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিংবা সম্পদ বলতে খুব সামান্য জিনিসই আবিষ্কার হয়েছিল।

খ) **রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে।** ক্ষমতা এবং মর্যাদা উভয়েই সম্পদের পাশাপাশি বেড়ে যায় এখানে। এর মানে এই নয় যে অন্য কোন উপায়ে এখানে মর্যাদাবান হবার পথ নেই। কিন্তু সম্পদ যেহেতু ব্যক্তির হাতেই থাকতে পারে – তাই সম্পদের বাড়তি সুবিধা ব্যক্তির পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় এই ব্যবস্থায়। ফলে ব্যক্তিগত মনোভাব বেড়ে যায়। আগের ব্যবস্থায় যেখানে সামাজিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব ছিল অধিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

গ) **রাষ্ট্রে শক্তি বা বল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অনেক শক্তিশালীভাবে কাজ করে।** সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের হাতে নানান শক্তি সঞ্চিত থাকে। রাষ্ট্র সেটা প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতে পারে। সাধারণভাবে ভাবা হয় কোন অশুভ শক্তির বিপক্ষে এই সব বাহিনী কাজ করে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস বলে যে এই সব শক্তি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। উপরন্তু, নানাবিধ আধুনিক অস্ত্রের আবিষ্কার রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে পোক্ত করেছে।

ঘ) **রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি বিশাল।** আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে যাবতীয় কথ্য ঐতিহ্য বিলীন এবং গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। আগেকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ম-কানুনের উৎস ছিল মানুষের বিচার বুদ্ধি এবং কথ্য অভিজ্ঞতা। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম লিখিত আইন দ্বারা পোক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর পক্ষে হত্যাযজ্ঞ করাও সম্ভব হয়। আর তা আইনের দ্বারা অনুমোদন পায়। লেখ্য ব্যবস্থার শক্তি বুঝতে চাইলে আর একটি বিষয় উলে- খ করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের সীমারেখা খুবই গুরুত্ব বহন করে। বহু দেশের মধ্যে এই সীমারেখার সঠিক মাপ নিয়েই যুদ্ধ হবার নজির আছে। আর এই সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় ভূগোলবিদের অঙ্কনের মাধ্যমে। কখনো কখনো রাষ্ট্র বলতে আমরা ঐ আকাঁ ছবিটাই মনে করতে পারি কেবল।

রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং বিস্তার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে লেখাপড়ার জগতে বিতর্ক আছে। বিতর্কটা বহুদিন ধরেই চলছে। বিতর্কটার প্রেক্ষাপট হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূমিকা। এর মানে হ'ল রাষ্ট্র মানুষের জন্য কল্যাণকর কিনা সেই তর্কের উপরেই ব্যাখ্যাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন রাষ্ট্র মানুষের উপকার করে থাকে, তাদের সেবা দিয়ে থাকে। অন্যদের যুক্তি হচ্ছে: রাষ্ট্র প্রধানত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে এবং ধন-সম্পদশালীদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে থাকে। এই দুই অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে বড়-সড় দুইটা ঘাঁটি লেখাপড়ার জগতে আছে। একদিকে, কোন কোন পন্ডিত ব্যাখ্যা দেন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, চুক্তির মাধ্যমে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রকে যাঁরা দমনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে থাকেন তাঁদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সমাজের শক্তিশালীদের সংঘ হিসেবে। নৃবিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে বেশ কিছু তাত্ত্বিক এর থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রযুক্তি এবং পরিবেশকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সেটা শুরুতে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হলেও পরবর্তীতে নানারকম সমালোচনার মধ্যে পড়ে। সমালোচকগণ এই ব্যাখ্যার অসারতাগুলো চিহ্নিত করেন। এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানে চলমান বিতর্কগুলোকে বিবেচনা করলে মোটামুটি তিন ধরনের চিন্তাধারা পাওয়া যায়।

প্রযুক্তি ও পরিবেশ ... ধারার চিন্তা বিদদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মূলত পরিবেশ এবং প্রযুক্তির বদলের কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রথমটি প্রযুক্তি ও পরিবেশ ধারা। এই ধারার চিন্তাবিদদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মূলত পরিবেশ এবং প্রযুক্তির বদলের কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। পরিবেশের দিক থেকে চিন্তা করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যা বাড়বার কারণে মানুষের পক্ষে ছোট দলের সমাজ ব্যবস্থাতে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে, কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেড়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক সমাজের সাথে সাথে। তাই কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা হ'ল কৃষির উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন বেড়ে গেল। একই সঙ্গে তা জটিল ব্যবস্থারও হয়ে গেছে। ফলে সমাজের ব্যবস্থাপনা করা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেচ বা এই ধরনের সুযোগ কৃষি কাজে সরবরাহ করবার জন্যও সাংগঠনিক কাঠামোর দরকার পড়েছিল। রাষ্ট্রের মত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এইসব তাগিদ থেকেই। তাঁদের ব্যাখ্যার পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো হয়ে থাকে। তা হচ্ছে: পৃথিবীর আদি সভ্যতার সবগুলিই কোন না কোন নদীর পাশে। যেমন: সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদের পাড়ে। মিশর সভ্যতা নীল নদের পাড়ে, আর চীনের সভ্যতা হোয়াং হো'র পাড়ে অবস্থিত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় সেচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে। এই ধারার চিন্তা-ভাবনা থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

উঁচু শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন এভাবে সমাজে প্রহরী রাখার ব্যবস্থা চালু হ'ল। এই প্রহরী দলই সামরিক বাহিনীর সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীকে চাপে রাখা এবং দমন করে রেখে নিজেদের সুবিধা বজায় রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

দ্বিতীয় ধারার নাম দেয়া যেতে পারে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র (political economy) ধারা। এই ধারাতে ভাবা হয়ে থাকে সমাজে সম্পদের ধরন বদলাবার সাথে সাথে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবার একটা দল তৈরি হয়েছে। সমাজে এভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হয়েছে। সম্পদ জড়ো করা এই দলকে ধনী শ্রেণী বা মালিক শ্রেণী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য শ্রেণী শ্রম দেয় এবং সেই সম্পদ তৈরি করে থাকে। আপনারা অর্থনৈতিক সংগঠন অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা দেখেছেন। সম্পদ যখন কোন শ্রেণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবার। এ ছাড়াও বঞ্চিত শ্রেণী যেহেতু পরিশ্রম করে সেগুলো উৎপাদন করে, তারাও মালিকদের সম্পত্তিকে দখল করতে চাইতে পারে। ফলে উঁচু শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তারা নিজেদের এই আয়েশী উৎপাদন না করা জীবন রক্ষা করতেও চাইল। এভাবে সমাজে প্রহরী রাখার ব্যবস্থা চালু হ'ল। এই প্রহরী দলই সামরিক বাহিনীর সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীকে চাপে রাখা এবং দমন করে রেখে নিজেদের সুবিধা বজায় রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। দমন করবার সেই প্রাথমিক ব্যবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে বহু দপ্তর তৈরি হয়েছে। এই চিন্তাধারা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে অন্য রাষ্ট্রকে কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করে। ইউরোপে শিল্পের বিকাশের পর মালিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয়েছে। কৃষির পর শিল্প আসার পর মুনাফা বা লাভের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। মুনাফার লোভে নতুন দেশ থেকে কাঁচামাল পাবার জন্য আক্রমণ করার নজির আছে। তাছাড়া আছে কোন উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ে লড়াই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর ভাল উদাহরণ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উগ্র জাতীয়তাবাদ কাজ করেছে, সেই সাথে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারও আছে। এই ধারার চিন্তকগণ জাতীয়তাবাদকেও উচ্চ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে দেখেছেন।

তৃতীয় ধারাকে আমরা ঐতিহাসিক ধারা বলতে পারি। এই ধারার প্রধান আগ্রহ ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিয়ে। উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে পৃথিবী ব্যাপী,

বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে জড়ো করতে চেয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি তারা অর্জন করেছিল। উপনিবেশ স্থাপন করবার আগের সময়কালে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। বাস্তবে এই পার্থক্যটাই অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বড় পার্থক্য ছিল। উপনিবেশ স্থাপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ জড়ো হয়েছে ইউরোপে। শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পেয়েছে তারা উপনিবেশ থেকে। আর এভাবে উপনিবেশের সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বল কাঠামোর উপরেই ইউরোপের দর্শন এবং চিন্তা-ভাবনা সমেত আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সকল এলাকা থেকে উপনিবেশ সরে গেছে তখন এই রাষ্ট্র কাঠামো থেকে গেছে। তখন অন্য দেশগুলো হতে বাণিজ্যের মাধ্যমে সুবিধা বজায় রেখেছে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের চাহিদা তখন এইসব রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে। ফলে একটা দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাঠ করা দরকার বলে এই ধারা যুক্তি দেখায়।

শ্রেণী ভেদাভেদ

রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সম্পদশালীর বাড়তি ক্ষমতা এবং সুযোগ থাকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশেষভাবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শিল্পভিত্তিক সমাজে। শিল্পভিত্তিক সমাজে পূর্বতন সমাজ অপেক্ষা সম্পদের ধরন এবং পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যাপক চল বাড়ে। ফলে সেই ভোগ করবার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য হবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী ভোগ করবার সেই সুযোগ পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রের আইন কানুন ও তৈরি হয়ে থাকে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য। এমন কোন নজির পাওয়া যাবে না যেখানে কোন রাষ্ট্রের আইনে ব্যক্তির হাতে অধিক সম্পদ থাকাকে অপরাধ বলে দেখা হয়। কিছু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু সেখানেও সম্পদশালী শ্রেণী অল্প বেশি ছিল। পক্ষান্তরে, শ্রমিকদের আয় হবে কতটা তাও রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন বা দপ্তর দেখভাল করে থাকে। কখনোই শ্রমিকদের এরকম আয়ের পথ থাকে না যে তাঁরা অনেক ভোগ্যপণ্য খরিদ করবেন কিংবা অবকাশ কাটাবেন। ভোগ্যপণ্য, আরাম-আয়েশ এবং অবকাশ একেবারেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজনের জন্য বরাদ্দ। এ কথা ঠিক যে শিল্পোন্নত কিছু দেশে শ্রমিকদের আয় তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের থেকে বহুগুণ বেশি এবং বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধাও তাঁরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থা তাঁদের নিজ দেশের ধনীদের তুলনায় নগণ্য।

ভোগ্যপণ্য, আরাম-আয়েশ এবং অবকাশ একেবারেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজনের জন্য বরাদ্দ।

রাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেকার এই পার্থক্য নানাভাবে টিকিয়ে রাখা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে সংসদ থাকে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কার্যসূচি জনগণকে জানিয়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে সেই সংসদে বসে আলাপ-বিতর্ক করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এছাড়া আছে শক্তিশালী বিচারালয়। এত কিছুর মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জন্য বড় ধরনের কোন পরিবর্তনের নজির নেই। বরং কোন কোন বিশ্লেষকের মতে এই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এই বিভাগগুলো কাজ করে থাকে।

বলপ্রয়োগ ব্যবস্থা

রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে ভয়ানক দিক হচ্ছে এখানে নিয়ম মাফিক বল প্রয়োগ করবার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আছে, পুলিশ বাহিনী আছে, সীমানা রক্ষী বাহিনী আছে। এই সব বাহিনীকে যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব। সাধারণভাবে সীমানা প্রহরীদের কাজ দেশের সীমারেখাতে বাইরের কাউকে বা অবৈধ দ্রব্যাদি ঢুকতে না দেয়া। সামরিক বাহিনীর কাজ হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের সীমারেখা থেকে বহিঃশত্রুকে হঠিয়ে দেয়া। প্রয়োজনে সেই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা। তবে ইদানিংকার দুনিয়ায় কোন দুইটা রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে নিজেরা কোন ফল আনতে পারে না। শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করে। সাম্প্রতিক কালে উপসাগরীয় যুদ্ধ তার বড় প্রমাণ। পুলিশ বাহিনীর কাজ হচ্ছে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেটা করবার জন্য নিয়ম মাফিক প্রচুর ক্ষমতা তাদের হাতে দেয়া আছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের আছে, যা কিনা অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোতে ছিল না। সেটাই অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের আছে, যা কিনা অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোতে ছিল না।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অন্যদিকে নানান পরিধিতে ক্ষমতা সম্পর্ক দেখা দিয়েছে। নানান প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংঘ, দপ্তর, নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছে বলে ক্ষমতাকে চিনবার নানান এলাকাও তৈরি হয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে রাজনীতির বর্তমান মানে হচ্ছে ক্ষমতার সম্পর্ক, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের সম্পর্ক। সেই অর্থে রাজনীতিকে পাঠ করবার ক্ষেত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বেড়েও গিয়েছে। ফলে আজকের নৃবিজ্ঞানের আগ্রহ আধুনিক রাষ্ট্র-সমাজের রাজনীতি নিয়েও।

সারাংশ

অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এখানে সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত থাকে, বল বা শক্তি প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি ব্যাপক। সম্পদের ভিত্তিতে ভেদাভেদ বা শ্রেণী এখানে খুবই শক্তিশালী ব্যবস্থা। ভোগ্যপণ্য, আরাম-আয়েশ এবং অবকাশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজনই কেবল পেতে পারেন। এসব সুবিধা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনে সকল ধরনের বলপ্রয়োগ করে থাকে। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রে নানান রূপে এবং পরিধিতে ক্ষমতা-সম্পর্ক জন্ম নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন

২। ইউরোপীয় শিল্পভিত্তিক সমাজসমূহ "*সরল*" সমাজ খুঁজেছে কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দুনিয়া ব্যাপী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিস্তারের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। আজকের দুনিয়ায় রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীদের কাজ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

পাঠ - ৪

বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন
Peasant Movements in Bangladesh

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন :

- ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে
- কৃষক আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে জীবন যাপনের মান বৃদ্ধি
- বাংলা অঞ্চলে কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত কয়েকটি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কৃষক আর্থব্যবস্থা অংশে আপনারা জেনেছেন যে নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই কৃষকদের কর্মকান্ডকে একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। এই পদ্ধতিতে ভাবার একটা বিরাট সমস্যা আছে। প্রথমত মনে রাখা দরকার আমরা যে অর্থে কৃষক বলে থাকি সারা পৃথিবীতে সেই রকম কৃষক নেই। শিল্পোন্নত বিশ্বে কৃষকরা আর মোটেই সেরকম নন। দ্বিতীয়ত অন্যান্য অংশের কৃষকরা কোনভাবেই এক জায়গায় স্থির নেই। আমাদের সতর্ক থাকা দরকার যে কৃষক সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তায় অনেক সময়েই কৃষকদের অপরিবর্তনশীল ধরে নেয়া হয়। ধরে নেয়া হয়েছে যে কৃষকদের মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সে কারণেই এই আলোচনার শুরুতেই আমাদের বোঝা দরকার সারা পৃথিবীতে কৃষকদের জীবনে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে – কখনো প্রযুক্তি আসার কারণে, কখনো সরকারী নীতিমালার কারণে, কখনো আন্তর্জাতিক বাজারের চাপে। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন বুঝবার জন্য এই অঞ্চলের কৃষকদের বৈশিষ্ট্য বোঝা দরকার। আর তাহলে এখানকার কৃষিজ সম্পর্কের ইতিহাস খানিকটা জানা দরকার।

ব্রিটিশরা এখানে আসবার আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। এর মানে এই নয় যে তখন সমাজে সমতা ছিল। ক্রিস ফুলারের বক্তব্য হচ্ছে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অধিকার সৃষ্টি এবং সেগুলোকে টিকিয়ে রাখা কৃষিজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বিষয়গুলোকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল জমির উপর নিয়নত্রণ। কিন্তু আসলে ঠিক তাও নয়। যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হচ্ছে জমিতে উৎপাদিত শস্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ। রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল জমিতে বসবাসরত মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ। নির্দিষ্ট কোন জমিতে উৎপাদিত শস্যের ভাগীদার ছিল একাধিক ব্যক্তি কিংবা সমষ্টি, শাসক হতে একেবারে কৃষক পর্যায় পর্যন্ত। শস্য উৎপাদনের জন্যে কৃষকের শ্রম স্পষ্টতই অপরিহার্য। কেবল তাই নয়, সে সময়ের ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল কম এবং সে তুলনায় জমি ছিল অত্যাধিক। নিয়মিত ফসলের হিস্যা আদায় করার লক্ষ্যে কৃষককে জমিতে বসবাসরত রাখা ছিল শাসকবৃন্দের স্বার্থ। মোঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা ছিল একটি বিশাল পিরামিডের মতন: পিরামিডের সর্বনিম্নে অবস্থিত ছিলেন রায়ত বা কৃষক, তার উপর ছিলেন জমিদার, তার উপরে প্রধান কিংবা দলপতি, তারও উপর মানসাবদার, তার উপর জায়গীরদার এবং আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ায় ছিলেন স্বয়ং মোঘল সম্রাট। সম্রাট হতে জমিদার, প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমষ্টি ততক্ষণই ক্ষমতাবান যতক্ষণ তিনি অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন এবং জমি হতে শস্যের ভাগ আদায় করতে পারছেন। শস্যের ভাগ আদায় করতে না পারলে রাজনৈতিক স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সিপাহীসালা, অথবা অস্ত্র, কোনটাই মজুদ রাখা সম্ভব ছিল না যেটি কিনা মোঘল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার প্রধান উপায় ছিল।

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল জমির উপর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আসলে ঠিক তাও নয়। যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হচ্ছে জমিতে উৎপাদিত শস্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ।

মোঘল সাম্রাজ্যের গ্রামগুলো ছিল দুই ধরনের : রায়তওয়ারী এবং জমিদারী। জমিদার শ্রেণী রায়ত কিংবা কৃষক শ্রেণীর এক ধাপ উর্দ্ধে অবস্থিত; তাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ছিল কৃষকের উৎপাদিত ফসলের একটি ভাগ।

মোঘল সাম্রাজ্যের গ্রামগুলো ছিল দুই ধরনের : রায়তওয়ারী এবং জমিদারী। জমিদার শ্রেণী রায়ত কিংবা কৃষক শ্রেণীর এক ধাপ উর্দ্ধে অবস্থিত; তাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ছিল কৃষকের উৎপাদিত ফসলের একটি ভাগ। জমির মালিকানার অর্থ সে কালে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা বোঝাত না, বোঝাত জমিদারীতে বসবাসরত মানুষ এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের হিস্যার উপর অধিকার। গ্রাম গড়ে উঠত

এভাবে : একটি জাতিবর্ণ কিংবা গোত্রের সদস্যগণ গ্রামের পুরনো অধিবাসীদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করত, অথবা তারা কোন খালি জায়গাকে বাসযোগ্য করে তুলত। যদি প্রথমটা ঘটত তাহলে সৃষ্ট হ'ত জমিদারী গ্রাম। দ্বিতীয়টা ঘটলে সৃষ্ট হ'ত রায়তওয়ারী গ্রাম যেহেতু তারা নিজেরাই রায়তী কিংবা কৃষক। অর্থাৎ, রায়তওয়ারী গ্রাম হচ্ছে জমিদার-বিহীন গ্রাম। কালানুক্রমে সে গ্রামে যদি অন্য কোন গোত্রের উদ্ভব ঘটত, এবং নতুন গোত্র পুরানদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত অথবা হেরে যেত, তাহলে জমিদারী গ্রাম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরী হ'ত। একেবারে প্রথমে না হলেও পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে, বিজয়ী গোত্র কিংবা জাতিবর্ণের অধিকার পরিণত হতে পারত জমিদারী অধিকারে। অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারীর অধিকার বিজয়ী গোত্রের বিভিন্ন নেতৃত্বদানকারী সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকত। জমিদারী অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য বলপ্রয়োগ এবং শারীরিক / পেশী শক্তি ছিল অপরিহার্য। ক্রিস ফুলার বলেন : দুটি বিষয় মনে রাখা জরুরী। প্রথমত, জমিদারের উৎপত্তি প্রায় সবসময়ই হত কৃষক শ্রেণী হতে। একারণে তাদের মধ্যে কোন নিরঙ্কুশ পার্থক্য ছিল না। বরং ক্ষমতাকে যদি আমরা লাগাতার হিসেবে ভাবি তাহলে বলা যায় যে এক পক্ষের ক্ষমতা ছিল কিছুটা বেশী, অপর পক্ষের কিছুটা কম। দ্বিতীয়ত, স্থানিক পর্যায়ে অধিপতি শ্রেণী চক্রাকারভাবে পরিবর্তিত হ'তে (circulation of elites)।

বৃটিশরা জমির মালিক খুঁজছিলেন কিন্তু তারা জমির মালিক বলতে যা বুঝতেন সে অর্থে কোন মালিক ছিল না।

বৃটিশ শাসন মোঘল কৃষি ব্যবস্থায় বড়-সড় রদবদল ঘটায়। ভারতবর্ষের যে কোন ভূখন্ড দখলের পর, নতুন শাসকদের প্রথম কাজ ছিল জমির খাজনা আদায় করা কিন্তু সেটির জন্য প্রয়োজন ছির জমির মালিক কে বা কারা সে ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া। পূর্বতন খাজনা ব্যবস্থা বৃটিশদের বোধগম্যের বাইরে ছিল। বৃটিশরা জমির মালিক খুঁজছিলেন কিন্তু তারা জমির মালিক বলতে যা বুঝতেন সে অর্থে কোন মালিক ছিল না। পরে অবশ্য তারা মালিক পক্ষ "খুঁজে" বের করলেন এবং তাদের সঙ্গে একটি "মীমাংসা"য় পৌঁছালেন ঠিকই কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল একটি স্থায়ী জমির-মালিক শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা হবেন বৃটিশ ক্ষমতার নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক মিত্র। বৃটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ব্যক্তি মালিকানার ধারণা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র জমিতে ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টি করেনি, তারা তাদের প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রয়োগ করেছে। সেটিকে আইন দ্বারা, চূড়ান্তভাবে বললে বৃটিশ ক্ষমতা দ্বারা, রক্ষা করেছে। বৃটিশ শাসকদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে পুরাতন অধিপতিশীল শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, এবং একটি নতুন অধিপতিশীল শ্রেণী তৈরী হ'ল। নতুন এই আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার চালিকাশক্তি পূর্বের ব্যবস্থার মত বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক ছিল না, উৎপাদিত ফসলে ভাগ বসানোর ব্যাপারও ছিল না। নতুনটির কেন্দ্রে ছিল বাজার প্রতিযোগিতা। এটি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা হতে গড়ে উঠেছিল। নতুন-সৃষ্ট ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের ভাগাভাগির পরিবর্তে গড়ে উঠে একটি নতুন লক্ষ্য : বাজার ব্যবস্থা মোতাবেক জমি-সংগ্রহ।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করলেন। এর মাধ্যমে বাস্তবে চিরস্থায়ী জমিদার তৈরি হ'ল। ফলে কৃষকদের পক্ষে কোন জমিদারকে উচ্ছেদ করবার বাস্ড়ব কোন মানে থাকল না।

উপরের আলোচনার বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ কৃষকদের আন্দোলন ব্রিটিশ আমলের আগে ছিল প্রধানত জমিদারদের বিপক্ষে। সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সম্পদটুকু রাখা এবং নির্যাতন বন্ধ করা। ব্রিটিশ শাসনে এই পরিস্থিতিটা পুরো পাল্টে যায়। কৃষক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এক থাকলেও কৃষকদের প্রতিপক্ষ অনেক বদলে যায়। আর কৃষকদের উপর নির্যাতনের ধরনও অনেক জটিল হয়ে পড়ে। এখানে আমাদের কয়েকটি ব্যাপার খুবই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম জমির মালিকানার ধরন আমূল বদলে গেল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করলেন। এর মাধ্যমে বাস্তবে চিরস্থায়ী জমিদার তৈরি হ'ল। ফলে কৃষকদের পক্ষে কোন জমিদারকে উচ্ছেদ করবার বাস্তব কোন মানে থাকল না। কারণ ইতোমধ্যেই কোর্ট কাচারী ও আইনের মাধ্যমে জমির উপর চিরস্থায়ী মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন জমিদারের শোষণে অতিষ্ট হয়ে তাঁকে হঠালেও সেই জমিদারের আইনগত ওয়ারিশ পরবর্তী জমিদার হয়ে যাবে। উপরন্তু মোঘল ভারতে জমির উপর কৃষকদের যে হক স্বীকৃত ছিল তাও আর রইল না। আরও কিছু মৌলিক বদল ঘটেছে। আগে বিভিন্ন অঞ্চল বা পরগণাতে কার্যত বিভিন্ন রকম নিয়ম এবং ব্যবস্থা ছিল। সেটা চাষের চুক্তি বা ফসলের হিস্যা যাই হোক না কেন। ব্রিটিশ আমলে সমগ্র ভারতের জন্য একটা অখন্ড আইনী ব্যবস্থা চালু হ'ল। ফলে কৃষকদের লড়াই বা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল খোদ আইনী ব্যবস্থার বিপক্ষে। এর অন্য কারণও আছে।

মোঘল যুগে আইনী কাঠামো ছিল কৃষি নিয়ে। সেগুলোর নাম ছিল বাদশাহী ফরমান। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আইনের শক্তিমত্তা অনেক বেড়ে গেছিল নয়া পদ্ধতির বিচার কাঠামোর কারণে এবং একটা অখন্ড ব্যবস্থা সমস্ত ভারতের জন্য কায়েম হয়েছিল বলে। তাছাড়া সেই আইনকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী নিয়োগ হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগে সাধারণ কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হ'ত জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং লড়াই হ'ত লাঠিয়ালদের বিপক্ষে। ব্রিটিশ ভারতে তা বদলে গিয়ে হ'ল আইন এবং পুলিশের বিপক্ষে। অন্য ভাষায় বললে রাষ্ট্রের সাথে। চিরস্থায়ী জমিদাররা যেহেতু ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থের অনুকূল ছিল তাই তাদের রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ রাজ এবং পুলিশ বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা চালাত। কৃষক আন্দোলনের লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় এই সময়কালে একাধিক বড় মাপের কৃষক আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে এই শতকের তেভাগা এবং তেলেঙ্গানা সংগ্রামের স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। এখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এই শতকের বিশের দশক থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর কার্যক্রম ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর মানুষজনের আন্দোলনকে সংগঠিত করা। তাতে করে নানান স্থানে বেড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হতে থাকল। যদিও কৃষক আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন হয়নি কিন্তু এই আন্দোলনগুলির বিরাট গুরুত্ব এই কারণে যে সেগুলি কৃষকদের জীবনকে বদলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তেভাগা আন্দোলন বাংলা অঞ্চলেই মূলত বেড়ে উঠেছিল। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক কালের দুটি আন্দোলন নিয়ে টীকা দেয়া হচ্ছে।

চিরস্থায়ী জমিদাররা যেহেতু ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থের অনুকূল ছিল তাই তাদের রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ রাজ এবং পুলিশ বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা চালাত। কৃষক আন্দোলনের লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় এই সময়কালে একাধিক বড় মাপের কৃষক আন্দোলন হয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানত বাংলা অঞ্চলে। এর স্থায়িত্ব ছিল '৪০-এর দশকের শুরু হতে মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই আন্দোলন আপাতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার কিংবা জোতদারদের বিপক্ষে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আবার চূড়ান্ত বিচারে এই আন্দোলনের লড়াইকারী শক্তির বিপক্ষ ছিল ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র। বিভিন্ন অঞ্চলে তখন জমিদার শব্দটির পাশাপাশি জোতদার শব্দটি ব্যবহৃত হ'ত। বিশেষভাবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে জমির খন্ডকে জোত বলা হয়ে থাকে। জোতদার কথাটার তাই মানে দাঁড়ায় যার অনেক পরিমাণে জমি আছে। অন্য ভাষায় জমিদার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইতোমধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদাররা বংশ পরম্পরায় জমির মালিক হয়ে গেছে। ফলে কৃষকদের জীবনের উপর আগের সময়ের তুলনায় আরো অনেক বেশি অত্যাচার নেমে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল ফসলের হিস্যা। এখানে আর একটি পরিবর্তনের কথা বলা প্রয়োজন। জমির মালিকানার বদলের পাশাপাশি লাভজনক শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষকদের হাতে জমি ছিল খুব সামান্যই। ফলে বর্গাচাষ পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। বর্গাচাষ পদ্ধতির সাথে তেভাগা আন্দোলনের যোগাযোগ খুবই নিবিড়। তাই তেভাগা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বর্গাচাষ ব্যবস্থা নিয়ে ধারণা থাকা দরকার।

এটা খুবই পরিষ্কার যে মালিকানার নিশ্চিত ব্যবস্থা না হলে বর্গাচাষ ব্যবস্থা পোক্ত হ'ত না। অর্থাৎ কাগজে কলমে জমির মালিক দেখা দিল বলেই সেই মালিকের কাছ থেকে জমি বর্গা নেবার পরিস্থিতি তৈরি হ'ল। বর্গাব্যবস্থা হচ্ছে কোন জমির মালিকের কাছ থেকে চুক্তিতে জমি নিয়ে সেই জমিতে চাষবাস করা। এখানে চুক্তির প্রধান ব্যাপার হ'ল ফসলের হিসাব করা। তেভাগা আন্দোলনের আগে উৎপাদিত ফসলের বড় অংশই জমির মালিক নিয়ে নিতেন। সেটার পরিমাণ ছিল মোটামুটি তিন ভাগের দুই ভাগ। এই রকম পরিমাণে ফসল দিয়ে দিতে হ'ত বলে চাষীর অবস্থা দিন দিন নাজুক হতে থাকল। শরীরের পরিশ্রম, হালের বলদ খাটিয়ে চাষী পেতেন সামান্য পরিমাণ ফসল। আর কোন পরিশ্রম না করেই জমির মালিক বা জোতদার পেতে থাকলেন সিংহভাগ ফসল। বর্গাচাষীদের সকলেরই পূর্বসূরীরা ছিলেন রায়ত কৃষক। আগে খাজনা দিতে হ'ত। নতুন ব্যবস্থায় সেটা জমির দাম বা ভাড়া হিসাবে দেয়া লাগল। আর তাতে পরিমাণটাও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছিল। অনেক ক্ষেত্রে বর্গার উপচুক্তিও হ'ত। অর্থাৎ এক পরিবার বর্গা নিয়ে আরো দরিদ্র পরিবারকে সেই কাজ দিচ্ছে এবং লাভের ফসল রেখে দিচ্ছে। এই মধ্যসত্বভোগী কৃষক শ্রেণীর কারণে চাষী কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেল। এর মধ্যে দুর্যোগ,

খাতা কলমে প্রধান দাবী ছিল ফসলের তিন হিস্যার দুইটা দিতে হবে চাষীকে, যিনি শারীরিক পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে থাকেন। কিন্তু এই সংগ্রাম ছিল আসলে জমির মালিক বড়লোক শ্রেণীর এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

অনাবৃষ্টি, ফসল না হওয়ার মত প্রাকৃতিক আক্রমণ তো আছেই। এটা ঠিক যে বর্গাচাষীদের মধ্য থেকে অনেক পরিবার পরবর্তীকালে শহুরে লেখাপড়া করা সুবিধা পাওয়া শ্রেণীতে এসেছে। কিন্তু সেটা সাধারণ কোন অবস্থা নয়। সাধারণ কৃষকদের জীবন মৃত্যুতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে এই জীবন বদলাবার দুর্দান্ত আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এক সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেন। খাতা কলমে প্রধান দাবী ছিল ফসলের তিন হিস্যার দুইটা দিতে হবে চাষীকে, যিনি শারীরিক পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে থাকেন। কিন্তু এই সংগ্রাম ছিল আসলে জমির মালিক বড়লোক শ্রেণীর এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

কৃষকদের এই দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে সভা-সমিতি এবং বিক্ষোভ করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। অবশ্য উত্তর বাংলাতে আন্দোলনটি বেগবান ছিল বলে লিখিত ইতিহাসে এই অঞ্চলের কথাই বেশি জানা যায়। এই পদক্ষেপ নেয়ার সাথে সাথেই জমির মালিকরা একদিকে পুলিশ এবং অন্যদিকে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল দিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিল। অত্যাচার বলতে মারধোর, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া, খুন, গুম এবং ধর্ষণ। পুলিশ মারধোর করা ছাড়াও গ্রেফতার করে পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন চালাতো কৃষকদের উপর। জমির মালিকরা আরেকটা কাজ শুরু করেছিল। লাঠিয়াল গুণ্ডা দিয়ে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল জমি থেকে কেটে নিয়ে আত্মসাৎ করত তারা। এর জবাবে কৃষকরাও দল বেঁধে উৎপাদিত শস্য তুলে নিয়ে আসতেন নিজেদের ভান্ডারে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' ইত্যাদি শ্লোগান জনপ্রিয় হয় তখন থেকেই। কৃষকদের উপর পুলিশী এবং গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ এতটাই তীব্র হয়েছিল যে বহু কৃষকের তখন দিনরাত পালিয়ে থাকবার দরকার পড়ত। বিশেষভাবে যাঁরা সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কৃষকরা তখন নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পুলিশ ও জমির মালিকদের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দেয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষকদের সাহসী লড়াইয়ের গল্প এখনও ছড়িয়ে আছে। এর সব যদিও সংরক্ষণ করা হয়নি। একদিকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে পুলিশ, অন্যদিকে কৃষকদের জীবন যাপনের দাবী ছাড়া আধুনিক অস্ত্র বলতে কিছু নেই। কৃষক শ্রেণীর মানুষজন তখন নিজেদের ঢাল, সড়কি, বল- ম নিয়েই একাধিক যুদ্ধে পুলিশকে পরাস্ত করেছে। তেভাগা আন্দোলনের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে নারীদের বা কিষাণীদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ ছিল। বহু অঞ্চলে পুরুষদের বেশির ভাগ পালিয়ে ছিলেন এবং পুলিশের সঙ্গে মূল লড়াই হয়েছে নারীদের। আর বাংলাভাষী ছাড়া অন্য জাতির মানুষ এই আন্দোলনের বড় নির্মাতা ছিলেন: সাঁওতাল, হাজং, বা খাসিয়া। এই কৃষক আন্দোলন দেখে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকরা ভীত হয়েছিল, অন্যদিকে ভীত হয়েছিল বাংলার জমি মালিক শ্রেণী এবং উঠতি শহুরে শ্রেণী। কারণ কৃষকদের এই সংগ্রাম তাদের স্বার্থের বিপক্ষে ছিল পরিষ্কারভাবে। তবে জমির মালিক শ্রেণী এবং উঠতি শহুরে শ্রেণীর অনেক সদস্যই কৃষকদের এই ন্যায্য দাবীর স্বপক্ষে ছিলেন। শহরের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাঁরা কৃষকদের দাবী দাওয়াকে সমর্থন দিতেন কেউ কেউ। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ করতেন তাঁরা। এখানে প্রথমেই আসে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কথা। এই দলের বাইরেও অনেক সমাজতন্ত্রী কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনকে সহায়তা করে গেছেন। তেভাগা আন্দোলনের কারণেই ইলা মিত্রের মত নেত্রীর নাম উচ্চারিত হয়। কিন্তু নাম না জানা বহু কৃষক-কিষাণী পুলিশের বা লাঠিয়ালদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আর অন্য অনেকে কঠিন নির্যাতনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন যাঁদের নাম আমাদের জানার কোন সুযোগ হয়নি।

জমির মালিক শ্রেণী এবং উঠতি শহুরে শ্রেণীর অনেক সদস্যই কৃষকদের এই ন্যায্য দাবীর স্বপক্ষে ছিলেন। শহরের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাঁরা কৃষকদের দাবী দাওয়াকে সমর্থন দিতেন কেউ কেউ। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ করতেন তাঁরা। এখানে প্রথমেই আসে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কথা।

লিখিত ইতিহাসে এই আন্দোলনের নাম তেভাগা আন্দোলন। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে এর নাম বিভিন্ন ছিল। যেমন এই আন্দোলন ছড়িয়েছিল বহু অঞ্চলে তেমনি এর ধরন, দাবী দাওয়া এবং নাম হয়েছিল বিবিধ। কোথাও সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোথাও হাজং বিদ্রোহ, কোথাও বা টংকা বিদ্রোহ। খাতা কলমে তেভাগা লড়াইয়ে কৃষকরা জিতেছেন। বাংলা অঞ্চলে ফসলের ভাগের একটা বন্দোবস্ত হয়। কৃষক আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা নেয়। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের দাবীও জোরাল হয় এই আন্দোলন থেকেই। কিন্তু জমির মালিকানা কিংবা কৃষকের দুর্দশা তাতে বদলায় না। পরবর্তী

চিত্র ১: অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মানচিত্র

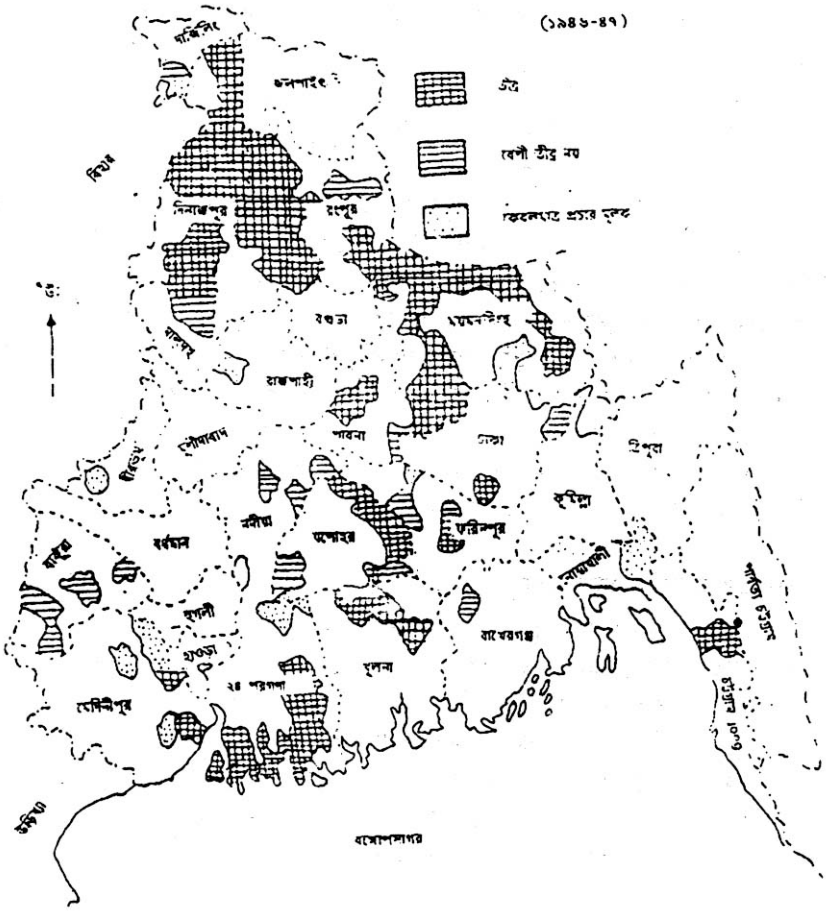

সূত্রঃ পিটার কাস্টার্স (১৯৯২) *তেভাগা আন্দোলনে নারী* [কৃষ্ণা নিয়োগী অনূদিত], ঢাকা: গণ সাহিত্য প্রকাশনী

কালে কৃষকদের দুর্দশা দেখে তা আমরা বুঝতে পারি। বাংলাদেশে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ ছাড়া গ্রাম থেকে ঘর হারানো মানুষ শহরে চলে আসছেন। সেখানে কাজ নেই। শহরে নিতান্ত অল্প মজুরির কাজ খুঁজছেন তাঁরা। সেটারও কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাই বলে দেয় কৃষকদের অবস্থা। কিন্তু নিজেদের জীবনের বদল ঘটাবার জন্য উদ্যম ও লড়াই তাঁরা থামাননি।

'৯৫-এর সার আন্দোলন

আধুনিক রাষ্ট্রের আধুনিক ব্যবস্থায় কৃষকের উৎপাদনের অনেক কিছুই বাজারের সঙ্গে যুক্ত। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি আসার কারণে জমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক বদলে গেছে। এখন সার, কিটনাশক, কৃত্রিম সেচ ছাড়া জমিতে ফসল ফলানো যায় না। দীর্ঘ দিন ধরে জমি হতে দেশজ ফসলের বীজ সরিয়ে কৃত্রিম বীজ চালু করার কারণেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর এই প্রচলনের জন্য রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করেছে। এই বদলগুলো ঘটানো হয়েছে উচ্চ ফলনের নামে। বীজ ও সার, কিটনাশক, সেচের সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবসা বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে। তারা সর্বক্ষণই এর প্রচার চালিয়েছে এবং গরিব দেশের সরকারকে এগুলো গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশ এরকম একটি দেশ। বাস্তবে ফসল বেশি হলেও কৃষকের জীবনের যে পরিবর্তন ঘটেনি, বরং আরো নাজুক হয়েছে তা উপরের আলোচনাতেই দেখা যায়। কিন্তু কৃষক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন অনেক কিছুর উপর। এরকম একটি দ্রব্য হচ্ছে সার। চাষের মৌসুমে চাষীর এটা লাগবেই। ফলে সারের বাজারের সঙ্গে চাষীর জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষভাবে ছোট চাষী এবং বর্গাচাষীদের জন্য এটা একটা কঠিন পরিস্থিতি যেহেতু তাঁদের হাতে নগদ পয়সা থাকে কম। আর সারের দাম বেশি হলে তাঁদের ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ প্রায়শই

সার ব্যবসায়ীরা নিয়ে থাকেন। তাঁরা চাষের মৌসুমে প্রয়োজনীয় সারের কৃত্রিম টানাটানি বাধিয়ে দেন কখনো। এর মাধ্যমে সারের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথবা অন্য কোন কারণে চাষীদের অবস্থাকে আরো দুর্দশাগ্রস্ত বানিয়ে দেয়া যায়। বড় জমির মালিকদের এই সংকটে পড়ার কোন কারণই নেই। প্রথমত তাঁদের উদ্বৃত্ত থাকে, দ্বিতীয়ত তাঁরা সাধারণত জমি বর্গা দিয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে সারের ব্যবসায়ী। '৯৫ সালে এই রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল। ক্ষুদ্র এবং বর্গাচাষীরা তাঁদের জমিতে চাষের মৌসুমে চাষ শুরু করতে পারছিলেন না। অথচ তাঁরা জানতেন যে সারের মজুদ আছে। এই পর্যায়ে তাঁরা ন্যায্যমূল্যে সারের দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করেন বিভিন্ন অঞ্চলে। ক্রমশ এটা ছড়িয়ে পড়ে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে। অনেক জায়গায় কৃষকেরা সারের গুদাম হতে সার বের করবার চেষ্টাও করেন। তাঁদের এই আন্দোলন দমন করবার জন্য চিরাচরিতভাবে পুলিশ মোতায়েন করে সরকার ও সার ব্যবসায়ীগণ। পত্র পত্রিকায় জানা যায় ১৫ থেকে ২০ জন চাষীকে গুলি করে মেরে ফেলে পুলিশ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কতজন চাষী মারা গেছেন সার চাইতে গিয়ে তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল।

'৯৮-এর ভূমিহীন আন্দোলন

আগের আন্দোলনটা যেমন প্রধানত বর্গাচাষীদের দ্বারা পরিচালিত একটা আন্দোলন ছিল, এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ভূমিহীন কৃষকদের দ্বারা। এটা সাতক্ষীরা অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলন। গত এক দেড় দশকে উপকূলীয় দক্ষিণ অঞ্চলে চিংড়ি চাষ করবার প্রবণতা বাড়ে। এই চাষ করে ধনী ব্যবসায়ীরা আরো মুনাফা পেতে পারে। কারণ বিদেশে চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা আছে। চিংড়ি চাষের জন্য সাধারণত নিচু জমি বেছে নিতে হয় যেখানে ধান জন্মে। অনেক এলাকাতে বেশ কিছু জমি চিংড়ি ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত মনে করেছে যেগুলো আবার খাস জমি হিসেবে ভূমিহীনদের দেয়া হয়েছিল। এ সকল জমি দখল করবার জন্য নানা রকম জোর জবরদস্তি, আইনী ফন্দি বের করেছিল চিংড়ি ব্যবসায়ীগণ। সাতক্ষীরাতে এভাবে প্রচুর জমি দখল করতে গেছে ব্যবসায়ীরা। যে সকল ভূমিহীনরা সেই জমি ব্যবহার করছিলেন তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এখানেও সম্মুখ সারিতে নারীরা ছিলেন। এই আন্দোলন দমন করবার জন্যও পুলিশ ও ভাড়াটিয়া অস্ত্রধারীদের ব্যবহার করা হয়। পত্র-পত্রিকায় জাহেদা নামের একজন নারীর মৃত্যুর খবর আসে। তিনি মারা গেছেন পুলিশের গুলিতে। ব্যাপক নির্যাতনের খবর তেমন ভাবে জানতে পারেননি মানুষজন। বেশ কয়েকজন শিশুকেও হত্যা করা হয় তখন।

কৃষকদের আন্দোলন একটা চলমান বিষয়। কেবল গুটিকতক আন্দোলনের খবর আমরা জানতে পাই। কিন্তু নিরন্তর নিপীড়িত দশা থেকে মুক্তির জন্য কৃষকেরা নিত্যদিন লড়াই করে চলেছেন মালিক এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

সারাংশ

বাংলা অঞ্চলের কৃষক-কিষাণী বিভিন্ন সময়কালে নানান অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তবে ব্রিটিশরা এখানে আসবার পরে সেটার অর্থ বদলে যায়। কারণ তার আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। এমনকি রায়তওয়ারী গ্রামগুলোতে জমিদারী শাসনও ছিল না। ব্রিটিশদের করা আইনে চিরস্থায়ী জমিদার সৃষ্টি হয়। এর বিরুদ্ধে কৃষকদের বিশাল আন্দোলন গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন নামে। জীবন বাজি রেখে লড়ে তাঁরা সেই আন্দোলনের কিছু দাবি আদায় করেন। কিন্তু কৃষক-কিষাণীর জীবনে খুব বড় বদল আসে না। সাম্প্রতিক কালেও নানা অঞ্চলে তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রাম-লড়াই চলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। মোঘল যুগে আইনী কাঠামো ছিল ------- নিয়ে।

ক. শিল্প　　খ. কৃষি

গ. আইন　　ঘ. বিচার কাঠামো

২। তেভাগা আন্দোলনের স্থায়িত্ব ছিল কত দিন?

ক. '৪০-এর দশকের শুরু হতে মাঝামাঝি পর্যন্ত

খ. '৫০-এর দশকের শুরু হতে মাঝামাঝি পর্যন্ত

গ. '৪০-এর দশকের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত

ঘ. '৫০-এর দশকের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত

৩। তেভাগা আন্দোলনের প্রধান দাবী কি ছিল?

ক. উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দিতে হবে চাষীকে

খ. উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হবে চাষীকে

গ. উৎপাদিত ফসলের চার ভাগের তিন ভাগ দিতে হবে চাষীকে

ঘ. উৎপাদিত ফসলের পাঁচ ভাগের চার ভাগ দিতে হবে চাষীকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কৃষক কে?

২। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের দাবী কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষকদের জীবনে কী ফল বয়ে বনে এনেছিল?

২। 'সার সংকটের ঘটনাবলী হতে বোঝা যায় রাষ্ট্রের শাসকবর্গ কৃষকদের বিপক্ষে' – আপনি কি তাই মনে করেন? আপনার অবস্থান যুক্তি দিয়ে লিখুন।